KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩/- ৩/- ৩/- ৩/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২ শ্রাবণ, ১৩৫২ ভাদ্র, ১৩৫২ আশ্বিন, ১৩৫২
	Condition : Brittle / Good
Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ্যাষ্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্র
কার্যালয়ে পাওয়া যাইতেছে।

৮, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯

বই-এর নাম	লেখক
১। রাশি ও লগ্ন বিজ্ঞান রহস্য	—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
২। হাতের রেখায় জীবন রহস্য	—ডঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ শাস্ত্রী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড
৩। Expression & Language of the Unconscious	—Sri Sabyasachi
৪। নতুন দৃষ্টিকোণে গ্রহ নক্ষত্র ও সাব	—শ্রীসব্যসাচী
৫। নাড়ী জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ রহস্য	—শ্রীবিষ্ণুদাস জ্যোতিঃশাস্ত্রী
৬। জ্যোতিষী শিক্ষা	—শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মা (১ম,২য়,৩য়,৪র্থ,৫ম খণ্ড) প্রতি খণ্ড ১০'০০, ৩
৭। Jyotish Sanchayan	
৮। Questions in Jyotisnatak Examination (1975-85) and Hints to Answer	—Viswanath Deva Sarma
৯। বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ	—শ্রীউৎপল চক্রবর্তী
১০। Table of Ascendants & Ephemeris	—By N. C. Lahiri
১১। লঘুজাতকম্	—অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য
১২। বৃহৎজাতকম্	—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৩। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ	—১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড
ঐ	৩য় খণ্ড
১৪। গ্রহের দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল	ডাঃ রণতোষ সাহা
১৫। ফলদীপিকা	—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
১৬। ভারতীয় সাহিত্যে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ	—ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়
১৭। জ্যোতিষতত্ত্ব সংকেত ও বিশ্লেষণ	—শ্রীমলয় রায়
১৮। মিথ্যা নয়, সত্য	—প্রীতি রায়
১৯। গ্রহের ভাবপতির দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল	—ডাঃ রণতোষ সাহা

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ~ নারায়ণ চৌধুরী

তৃতীয় বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২

প্রমথ চৌধুরী

প্রবন্ধসংগ্রহ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক নির্বাচিত
পঞ্চাশটি প্রবন্ধ

প্রথম খণ্ড ॥ সাহিত্য। ভাষার কথা
দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ভারতবর্ষ। সমাজ। বিচিত্র

প্রথম খণ্ড মূল্য ছয় টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য পাঁচ টাকা

প্রমথ চৌধুরীর অন্যান্য বই

বীরবলের হালখাতা	৩৲
চার-ইয়ারি কথা	২।০, ৩।০
Tales of Four Friends	১॥০
রায়তের কথা	॥০
হিন্দু সংগীত	॥০
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান	॥০

প্রমথ চৌধুরী সংখ্যা
বিশ্বভারতী পত্রিকা
মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

সমকালীন
তৃতীয় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

সাবেকী কথা

অসিতকুমার হালদার

ভগ্নী নিবেদিতা এবং অজন্তা যাত্রা

নন্দলালকেই গোড়া থেকে পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন এইভাবে। অন্যান্য শিষ্যদের তিনি তাদের স্বকীয় শক্তির উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর শিক্ষা দেবার পরীক্ষা চলত নন্দলালকে নিয়েই। প্রথম আমাদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী খোলা হয় ১৯০৮ সালে গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে। তাতে পূজনীয় অবনমামার, গগনমামার, নন্দলালের, ৺সুরেন গাঙ্গুলীর এবং আমার ছবি প্রদর্শিত হয়। স্বর্গীয় সুরেন গাঙ্গুলীর লক্ষণের শক্তিপেলা, লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন, কার্তিকেয় প্রভৃতি ছবি ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের পরমপ্রিয় সতীর্থসুহৃদ সুরেন অল্পকাল পরেই যক্ষা রোগে স্বর্গত হন। তাঁর মত একটি বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর অকাল মৃত্যুতে দেশের যে সমূহ ক্ষতি হয়েচে—সে ক্ষতি পূর্ণ হবার নয়। সুরেন ভায়ার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল;—কোনোক্রমে অতিকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব হ'তো। তাঁর এইরূপ অবস্থাবিপর্যয় দেখে করুণাপরবশ গুরুদেব অবনমামা তাঁর জন্য যখন কলকাতার সরকারী যাদুঘরে পোকামাকড় আঁকার একটি চাকরীর ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি সেই চাকরীগ্রহণে সম্মত হননি। কষ্টের জীবন শিল্পলক্ষ্মীর পূজায় তিনি নিবেদন করে গেছেন। দুঃখ এই যে এইরূপ একটি মহৎ শিল্পীর নামও আজ কেহই জানেন না। অবনমামার গোড়ার এই ছাত্রদের মধ্যে এমন একটি মিল ছিল যা আজ খুবই বিরল। আমাদের ক্রমশ দল পুষ্ট হ'তে লাগল প্রতিবৎসর। শৈলেন দে এলেন এলাহবাদ থেকে, হাকিম মহম্মদ এবং সামিউজ্জমা এলেন লক্ষ্ণৌ থেকে, ভেঙ্কেটাপ্পা এলেন মহীশূর থেকে, নাগাহাওয়াস্তা লঙ্কাদ্বীপ থেকে কলিকাতার গভর্মেণ্ট আর্টস্কুলে অবনীন্দ্রনাথের কাছে। ক্ষিতিন মজুমদার এদের সঙ্গে সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। ক্রমেই একটা দেশী চিত্রকলার রেনেসাঁর যুগ এসে গেল স্বদেশী মুভমেণ্টের আবহাওয়ার মধ্যে কলকাতা সহরে এইভাবে। আমাদের ছিল তখন দেশী শিল্পের গবেষণার কাল। পথ গুরুদেব

দেখালেন এবং আমাদের পথ কেটে বিচার করে চলতে হল। ভিক্টোরিয়া যুগের পর এই প্রথম আবার ভারতবর্ষে ভারতীয় আর্টের (কেবলমাত্র Bengal School এর নয়) ধারা নবীনভাবে এল। এক কথায় ভারতের নিজস্ব কলার নবীনতার দিকেই তখন আমরা চললুম—ফরাসী শিল্পী পিকাসোর গড়া নবীনতার জন্যে অপেক্ষা না করেই। সেই জন্যে আমাদের খুঁজতে হত দেশী শিল্পীদের—অর্থাৎ পটুয়াদের। জগন্নাথের পট, পটুয়াদের পট প্রভৃতি সংগ্রহ করাই ছিল আমাদের কাজ। ক্ষিতিন, ৺সুরেন, নন্দলাল এবং শৈলেনের সঙ্গে আমি প্রায় যেতাম কালীঘাটের পটুয়া পাড়ায়। ক'এক ঘর মাত্র পটুয়ারা তখন অবশিষ্ট ছিল—অন্য সবাই প্রেসে ছাপা ছবির চলন হওয়ায় জাতব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিল। আমরা তাদের নিকট গিয়ে তাদের আঁকার পদ্ধতি দেখতাম (অবশ্য অন্ধ অনুকরণ করার জন্য নয়) এবং রং ও তুলি তৈরীর ব্যাপার তাদের কাছে জেনে নিতাম। দেখতাম তারা প্রাচীন রীতিতে রং তুলি তৈরী করা প্রায় সব ভুলে গেছে—জার্মান সস্তা রং এবং দুএকটি কাঠবেড়ালীর ল্যাজের তুলি ছাড়া ছাগড়া পাকিয়ে চুঁচ্‌লো করে রংএ চুবিয়ে আঁকাই ছিল তাদের বিশেষ পদ্ধতি। এখনকার পট-বিলাসী নব-নকুলে পটুয়ারা মনে করেন যে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা পটের বিষয় কিছুই জানতেন না, তাঁদের কারবার ছিল কেবল মোগল কাংড়া এবং অজন্তার আর্ট নিয়ে। মৎপ্রণীত অজন্তা পুস্তকে বাং ১৩২০ সালে অজন্তার রেখাভঙ্গির সঙ্গে বাঙলাপটের রেখাভঙ্গির তুলনা করে লিখেছিলাম। তাছাড়া ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে আমি পটের বিষয় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আমরা প্রাদেশিকতা রক্ষার দ্বারা যদি দেশের আর্টের রেনেসাঁ আনার চেষ্টা করতাম তাহলে বাঙলাপটেরই নকলে কেবল ছবি এঁকে যেতাম। আমরা Bengal School করতে চাইনি, আমরা চেয়েছি সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষ্টির ধারাকে নতুন রূপ দিয়ে নবভাবে দেখাতে নিজেদের শক্তিমত। তাই আমাদের যেতে হত যাদুঘরে এবং পুরোনো curio dealerসদের দোকানে। সেখানে তাদের সংগ্রহের মধ্যে দেখতাম প্রাচীন তিব্বতি কাপড়ের উপর আঁকা চিত্রকলা, এবং তামা পিতলের তিব্বতি ও নেপালী নানাপ্রকার দেবদেবীর মূর্তি। অবনমামা কখন কখন আমাকে এবং নন্দলালকে তাঁর নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে যেতেন নাহারদের নতুন সংগৃহীত প্রাচীন মোগল রাজপুত ও কাংড়া ছবি দেখাতে। তাঁর ছিল রবারহীন চাকার বন্ধ গাড়ী—ঘোড়ার খুরধ্বনি এবং চক্রধ্বনি কর্ণ বধির করত। তিনি স্মিতমুখে বলতেন, "বেশ রথ—খড় খড় শব্দ নাহলে গাড়ী চড়ার মজাই নেই—কি বল ?"

পূর্বেই বলেচি গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল ছাড়া আমাদের কাউকে কখন ছবি আঁকবার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বা বিশেষভাবে আদেশ দিয়ে কাজ করাতেন না। আমরা ছিলাম এবিষয়ে free-lance আর্টিষ্ট। আমার পক্ষে এতে যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। আমার নিজের মনের গতি হিসাবে সহজভাবে ছবি এঁকে যেতুম মনের সাধে। কেবল আঁকা হয়ে গেলে একবার গুরুদেবকে দেখিয়ে নিতাম। প্রদর্শনীর সময়ে আমার ছবিগুলির নামকরণ করতেন পূজনীয় রবিদাদা মহাশয়। আমি একমাত্র শিল্পী ছিলাম মনের আবেগে আঁকতাম কিন্তু ছবির পিঠে নামকরণ করে লিখে রাখতাম না। তখনকার ছবি 'আপদ বিদায়' 'বাঁশীরডাক' 'দুর্দ্দিন' 'প্রকৃতির হেঁয়ালী' 'সুরের

আগুন' 'নিরুদ্দেশ যাত্রী' প্রভৃতি বহু ছবির নামকরণ করেছিলেন মহাকবি পূজনীয় রবিদাদা। আমার কাব্যচর্চা এবং গীতচর্চার সঙ্গে ছিল চিত্রকলার সাধনা। কোমর বেঁধে টেক্‌নিকের ওস্তাদী দেখানোর লক্ষণ আমার কোনকালেই ছিলনা এবং আজও তা নেই। অবনমামার প্রতিষ্ঠিত আর্ট-স্কুলের advanced design classএর এক মাষ্টার মশাই ছিলেন পাটনার পুরোনো 'মোসাব্বর' শিল্পী পরিবারভুক্ত একটি ভদ্রলোক, নাম লালা ঈশ্বরী প্রসাদ। কলকাতা রেলীব্রাদার্সের আফিসে কাপড়ের পাড়ের নক্সাকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হ্যাভেল (কলকাতা আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল) তাঁর সন্ধান পেয়ে তাঁকে আনেন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের প্রাচীন পদ্ধতিতে আঁকা শেখানোর জন্য। ঈশ্বরীবাবু হাতীর দাঁতের উপর miniature ছবি আঁকতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন—মৌলিক ছবি আঁকতে পারতেন না। পুরোনো ছবির নকল বেশ করতেন। ঈশ্বরীবাবু শিল্পী ছিলেন এবং ডিপ্লোম্যাটও ছিলেন। অবনমামার কাছে অবনমামার অনুরূপ মুখরোচক কথা বলতেন, আবার আমাদের ভয় দেখাতেন' "আপলোগ কেউ বড়ে আদমী টেগোর সাহাবকা দেরমে পড়ে হুয়ে হ্যায়—ইণ্ডিয়ান ক্যা আউর চলেগা ? Portrait বানানা শিখিয়ে পায়সা কামা সেকেঁগে।" ইত্যাদি। ঈশ্বরীবাবুর সুচেহারা এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল। নিজেকে সকলের নিকট 'প্রফেসার' বলে পরিচয় দিতেন। একটি বিষয় তাঁর ঘটনার উল্লেখ করলেই তাঁর ছবি ফুটে উঠ্‌বে। একদিন গুরুদেব খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম সেরে দুটোর সময় আর্টস্কুলে আমাদের ক্লাশে এসেচেন। সঙ্গে এঁকে এনেচেন একটি নতুন ছবি। এসেই নিজের আরাম কেদারায় (ক্লাশে তিনি যে কেদারায় নিত্য বসতেন) বসে ঈশ্বরী-বাবুকে ডেকে বল্লেন,—"ঈশ্বরী! শোনো শোনো, তোমাকে আমার আঁকা একটা নতুন ছবি দেখাই।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরীবাবু তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তিনি ছবিখানি পুঁটুলী থেকে বার করতে না করতেই বলে উঠ্‌লেন, "হুজুর ! বাঃ বাঃ ক্যা চমৎকার তশবীর হ্যায়।" তাঁর অকস্মাৎ ছবি না-দেখেই চাটু উক্তি শুনে অবনমামা বক্রদৃষ্টিতে স্মিতহাস্যে বল্লেন,—"আচ্ছা যব্‌ তুম্‌ তশবীর না-দেখ্‌কার এইসা তারিফ্‌ কর দিয়া, তব্‌ হাম আউর তোমকো তশবীর নেহি দেখলায়েঙ্গে।" এই বলে ছবিটি কিছুক্ষণের জন্য গুটিয়ে রাখলেন। এইভাবে ঈশ্বরীবাবুকে নিয়ে রঙ্গ তামাসা চলত। আমার একটি ১৯০৭ সালের আঁকা যশোদা কৃষ্ণের ছবি ১৯০৯ সালে কুমারস্বামী ৫০০৲ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। তাতে ঈশ্বরীবাবুর মনে চাঞ্চল্যের উদয় হয় এবং আমার অসাক্ষাতে গুরুদেবকে বলেন,—"অসিতকা হজুর আব্‌ দেমাক খারাপ হো যায়েগা" ইত্যাদি। এইভাবে ডিপ্লোম্যাসি ঈশ্বরীবাবুর ছিল আমাদের নিয়ে। আমার এই প্রথম বেশী দামে ছবি বিক্রী হওয়ায় সেই টাকায় রং তুলি এবং বেশী দামে সাইকেল কিনেছিলাম। আমার আড়াই বছর বয়স থেকে 'হারনিয়া' থাকায় সাইকেল চড়া বারণ ছিল, বাবাকে না জানিয়ে লুকিয়ে কিনেছিলাম। একদিন সাইকেলটি তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকাগাড়ীর মাথায় চড়িয়ে মামার বাড়ীর সামনে চিৎপুরের মোড়ে নাবিয়েচি আর জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দোতালায় দাঁড়িয়ে সৌম্য আমায় এই অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন। সৌম্য তখন বালক, কৌতুক ভরে আমার ব্যাপার লক্ষ্য করে ব্যাপারটা সকলের নিকট ফাঁস করে দেওয়ায় আমায় লজ্জায় ফেলেছিল। সেকথা আজও মনে আছে আমার।

একটা কথা পূর্বে বলতে ভুলে গেছি। অবনমামার ছিল আমার জন্য এক মহাদায়—আমার রোজগারের পথ তাঁকে উন্মুক্ত করতে হবে, নইলে আমার পিতা ক্ষুণ্ণ হবেন। তাই তিনি মাঝে আমার জন্য একবার ব্যবস্থা করলেন কাঠের উপর নক্সাকারী কাজ শেখার। আর্টস্কুলের মান্দ্রাজী শিক্ষক আচারীয়া এবিষয় শিক্ষা দিতেন। ল্যাজারাসে ১০০৲ মাসিক বেতনে একটি চাকরীরও গুরুদেব ব্যবস্থা করেছিলেন আমার জন্য। কিন্তু নিয়তির ফের—দুদিন আচারীয়া মাষ্টারের কাছে বাটালী ধরে আমার হাতের তলা গেল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে—কারীগর হবার সাধ গুঁড়ো হয়ে গেল সহসা। তারপর আবার একবার অবনমামা ব্যবস্থা করলেন মাটীতে মূর্ত্তিগড়া শেখবার। Leonard Jennings একজন ভাস্কর বিলাত থেকে সে সময় এসেছিলেন গভর্মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে। কলকাতা গভর্মেণ্ট হাউসে তখন বড়লাট থাকতেন এবং তাঁরই একটি ঘোড়ার আস্তাবলে studio ছিল তাঁর। হিরণ্ময় রায়চৌধুরী এবং আমি তাঁর কাছে ভাস্কর্য্যকলা শেখায় ব্রতী হলাম গুরুদেবের কৃপায়। বাড়ীতে ছবি আঁকতুম সকালে এবং জেনিংস্ সাহেবের studio ফেরৎ যেতাম প্রত্যহ অবনমামার কাছে তাঁর বাড়ীতে ছবি নিয়ে দেখাতে। জেনিংস্ সাহেব বিলাতে ফিরে যাবার কালে আমার চিত্রাঙ্কন প্রতিভা দেখে অবশেষে আমাকে বল্লেন চিত্রকলাতে লেগে থাকতে এবং অবনমামাকে তারজন্য সুপারিশ করলেন। হিরণ্ময়ের জন্য ব্যবস্থা হল বিলাতে ভাস্কর্যকলা শেখার। তিনি গেলেন তখন Royal Collage of Art লণ্ডনে ভাস্কর্য শিখতে। আমি অবনমামার নিকট আর্টস্কুলে আবার ফিরে এলাম।

আমাদের এই নবধারায় ভারতীয় শিল্পকলার চর্চ্চায় উৎসাহ দাতা প্রধান যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন N. Blunt, Justice Wooroff, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর আর J.C. Bose এবং Sister Nivedita। শ্রদ্ধেয় ভগ্নী নিবেদিতা আমাদের ছিলেন প্রধান উৎসাহ দাতাদের মধ্যে। ভগ্নী নিবেদিতার ১৯১০ সালের প্রদর্শনীর চিত্র সমালোচনা যা Modern Review পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় সেই বৎসর বেরিয়েছিল তা থেকে তাঁর আমাদের দেশী চিত্রকলার উদ্বোধন যজ্ঞে কতটা সহানুভূতি ছিল তা জানা যাবে। আমার ১৯০৭ সালের আঁকা সীতা ছবিটি সেই প্রদর্শনীতে দেওয়া হয়েছিল আমার অন্যান্য ছবির সঙ্গে। সীতার বিষয় তিনি লিখেছিলেন: "Asit Kumar Haldar's 'Sita' seemed to us the most successful attempt yet made, at the subject. Sita aught, undoubtedly, to have a pre-eminence in Indian art, like that of the Madonna in European. The very exaltation of their feelings for her, seems, however, to deter our Bengali artists from attacking her portraiture with the self confidence necessary to success." ভগ্নী নিবেদিতা সর্ব্বদা আমাদের এই জাতীয় জাগ্রতির প্রতি প্রীতি চক্ষে দেখতেন। শৈলেন, আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজারে গণেন ব্রহ্মচারীকে নিয়ে যেতাম। তাঁর বাড়ীতে একটি গরীব মেয়েদের স্কুল ছিল। সব জিনিষপত্র খুব তকতকে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার থাকত। মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে এইভাবে পরিচ্ছন্নতাও শিক্ষা দিতেন। আমাদের উপদেশচ্ছলে বার বার সাবধান

করতেন আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না-দি। তখন চলেছিল পার্টিশান হওয়ার পর প্রবল স্বদেশী আন্দোলন—দেশের তরুণের দল ক্ষিপ্ত বিদ্রোহিত। বোমা পিস্তল ইংরাজদের বিরুদ্ধে চল্‌চে—ধরা পড়চে—ফাঁসি যাচ্চে দেশের ছেলেরা। আমাদের হাতে দেশের অভিলুপ্ত আর্টের নব জাগরণ নির্ভর করচে—সেটাও দেশের জাগ্রতির ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগ্নী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন। আমাদের Renaissance কাজে উৎসাহ দেবার জন্য তাঁর এতদূর আগ্রহ ছিল যে আমরা পরে যখন ১৯০৯-১০ সালে অজন্তা যাই নিবেদিতা গোড়ার দিকে আমাদের কাছে সুদূর অজন্তায় লেডিজে সি বোস এবং ডক্টর বোসকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ৪০ মাইল গোজানে জালগাঁও ষ্টেশন থেকে অজন্তা যাওয়া তাঁদের পক্ষে খুবই অসুবিধার ছিল। আমাদের খাবার দাবার কষ্ট দেখে লেডি বোস কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমাদের জন্য প্রতি সপ্তাহে port parcelএ আলু পাঠাতেন। আমাদের ফরদাপুর ক্যাম্প থেকে ২০ মাইল দূরে ডাকঘরে লোক পাঠিয়ে আলুর পার্শেল আনাতে হ'তো। নিবেদিতা অজন্তা থেকে ফিরে আসার পূর্ব্বে আমাদের বারবার উপদেশ দিলেন জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন আমাদের Oriental Art Societyর প্রদর্শনীতে আসতেন এবং অবনমামার এবং গগনমামার সঙ্গে একযোগে আমাদের (শিল্পীদের) উৎসাহিত করতেন। তিনি অজন্তায় থাকার কালে একদিন একটি হনুমানজির মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে ছিলেন, "আমার খুব ইচ্ছা, এই গ্রাম্য দেবতার মন্দিরটিকে অবলম্বন ক'রে একটি Myths & Legends of the Hindus বই লিখব। আর তুমি আর নন্দলাল তার জন্য ছবি আঁকবে।" আমাকে বল্লেন Lyrical বিষয় আঁকতে এবং নন্দকে classical। আমার ছবিতে তিনি Lyric ধর্ম্ম পেতেন এবং নন্দলালের ছবিতে পেতেন Classical ভাব। বলতেন গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথের আমরা দুই শিষ্য দুই প্রকার গুণে গুণান্বিত। দুভাগ্যবশতঃ ভগ্নী নিবেদিতার Myths of Legends বইখানি লেখা শেষ হবার পূর্ব্বে অকালে দেহান্ত হয়। পরবর্ত্তী কালে কুমারস্বামী বইখানি লিখে প্রকাশ করলেন বটে কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত চিত্রকলার বিষয় কিছুই হলনা। আমি পূজনীয় নিবেদিতাকে জীবিত থাকার কালে গ্রাম্য হনুমানের মন্দিরের যে ছবিখানি এঁকে দিয়েছিলাম সেইটি এবং ধ্রুবের তপস্যা ছবি দুখানি ছাড়া আমি অন্য কোনো Lyrical ছবি এঁকে দিতে পারিনি। আমরা তখনকার কয়েক জন জাতীয় শিল্পকলার পুনরুদ্ধারের জন্য যে কাজ করেছি তাতে ভগ্নী নিবেদিতার উৎসাহ যে বল দিয়েচে তা লিখে বোঝানো অসাধ্য।

লেডি হেরিংহাম যখন অজন্তায় এলেন, সঙ্গে তাঁর এলেন মিস লিউক, মিস্ লারচার দুজন বিলাতী মহিলা শিল্পী। হায়দ্রাবাদ থেকে ফজলুদ্দিন কাজী এবং সৈয়দ আহমাদ এলেন। আমি নন্দলাল গেলাম প্রথমে ১৯০৯ সালে শীতের প্রারম্ভে অজন্তায়। নন্দলালকে অবনমামা Oriental Art Societyর ভাতা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমি রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের নিকট ছবি বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে গেলাম অজন্তায়। প্রথমে আমরা দুজন অজন্তা যাবার পর অবনমামা সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ভেঙ্কেটাপ্পাকে পাঠালেন আমাদের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে অজন্তায়। ক্ষিতিন মজুমদার

বা শৈলেন দে তখন নতুন এসে যোগ দিয়েছিলেন অবনমামার নিকট। তাই তাঁরা তখন যাননি অজন্তায়। অজন্তার ক্যাম্পে আমাদের একটি দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচার গল্প করি। ফরদাপুর ক্যাম্পের নিকট ফরদাপুর গ্রাম। ফরদাপুরের সরকারী ডাকবাংলার কাছেই আমাদের তাঁবু পড়েছিল। গ্রামের মোড়ল সাম্পাংজি একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করেন রাত্রভোজে। ভেঙ্কটাপ্পা এরূপ অনাচারে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন না। পাটেল আমাদের শ্রীখণ্ডি বাসন্তী বাজার রুটি লংকা প্রভৃতি ভূরি ভোজ দিলেন। আমরা ডিসেম্বারের শীতে খাওয়া দাওয়ার পর আগুন পোয়াচ্চি —হঠাৎ মনে হল ভেঙ্কটাপ্পার কথা। তিনি তখন 'ভুম্—তা—তাই—না—' আবৃত্তি করে বীণ বাজানো শেষ করে খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন এবং চেয়ারের বেতের সিটে মোমবাতী রেখে-ছিলেন দেখে এসেছিলাম আমরা। সেই কথা স্মরণ হতেই আমরা কালবিলম্ব না করে শিবিরে ফিরে এলাম। এসে দেখি মোমবাতী চেয়ারের বেতের 'সিট' ভেদ ক'রে তাঁবুতে বিছানো আস্তরণের উপর লেগে জ্বলচে। দ্রাবীড়ী বন্ধু নিদ্রাভিভূত—তাঁর হাতের বই চ্যুত—অগ্নির ইন্ধনে দগ্ধ এবং ক্রমে অগ্নি-শিখা বন্ধুর সুদীর্ঘ শিখায় লাগবার উপক্রম করচে। আমরা তার পূর্বেই তাঁর চৈতন ধরে টান দিতেই তাঁর চৈতন্য ফিরে এল। আশ্চর্য হলাম আমরা—যখন তিনি প্রথমেই তাকালেন তাঁর বীণা যন্ত্রটির দিকে আর বলে উঠ্‌লেন, "যাক্, বীণাটি তো পোড়ে নাই?" সেই তাঁবুতে অজন্তার নকল ছবির rollগুলি যে রাখা ছিল বা তাঁর অমূল্য প্রাণটি তার কথা তিনি একবারও ভাবলেন না। পূর্বে Cristal Palace Exhibitionএ Griffithsএর দলের আঁকা অজন্তার প্রতিলিপিগুলি একবার পুড়ে গিয়েছিল। তাই Lady Herringham ছবিগুলির প্রতি সর্বদা সতর্ক ছিলেন। ছবিগুলি নষ্ট হলে মহা বিপদ হ'ত।

অজন্তার আর একটি ঘটনার কথা এক্ষেত্রে এখন বলতে পারি, যা' বৃটিশ আমোলে বক্ষ্যমাণ কারণে বলতে সাহস করতুম না। আমাদের তাঁবু পাহারা দেবার জন্য হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকার তাঁর পুলিশ ফৌজের একটি ছাউনি পাঠিয়েছিলেন। লেডি হেরিংহামকে রক্ষা করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, আসচেন বম্বের লাট অজান্তা দেখতে। সেই উপলক্ষ্যে অজন্তা গুহাবলীর সামনে খসে পড়া বড় বড় পাথরের টুক্‌রোগুলো ডাইনামাইট দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হল—তার সঙ্গে গুহাশৈলীর কত যে নক্সাকারী ছবি ও মূর্তি ধ্বংস হ'ল তার দিকে কারু লক্ষ্য দেখলুম না। লেডি সাহেবা খুব বিরক্ত হলেন তাদের কাণ্ড কারখানা দেখে। তারপর আমাদের তাঁবু রক্ষক পুলিসের কাছে শোনা গেল বাঙলা দেশাগত শিল্পীদের লাটসাহেব আসার কালে ফরদাপুর ক্যাম্প থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে নজরবন্দী করে রাখতে। সেই সময় পুনায় একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর কোনো রাজ্যোদ্রোহী গুলি চালিয়ে ছিলেন। তখন একটা আতংক ইংরাজ মহলে হয়েছিল—বিশেষভাবে বাঙালী ও মহারাষ্ট্রদের উপর। এই প্রকার' সরকারী হুকুমের কথা শুনে রেগে গিয়ে লেডি সাহেবা আমাদের বল্লেন: "বিলাত হতো ত দেখে নিতুম—পার্লিয়া-মেণ্টে প্রশ্ন তুলতুম তোমাদের উপর এইপ্রকার অন্যায় ব্যবহারের জন্য।" তিনি অতঃপর নিজেও ফরদাপুর থেকে তাঁবু আমাদের সঙ্গে সরিয়ে বহুদূরে পাহাড়ের ধারে জঙ্গলে স্থাপনা করালেন। পরে

জানা গেল লাট সাহেব আসবেন না অজন্তায়। এলেন তাঁর পরিবর্তে একজন ইংরেজ কমিশনার লেডি হেরিংহামের তাঁবুতে। লেডি সাহেবা ক্রোধে উন্মত্ত—তাঁর সঙ্গে shake-hand পর্যন্ত করলেন না। লেডি সাহেবার তখন ৭২ বৎসর বয়স—মাথা ঘাড় কাঁপে, তথাপি তাঁর অদম্য কর্মানুরাগ ও উৎসাহ আমাদের খুবই অনুপ্রেরণা দিত কাজে। যে ছবিগুলি সকাল থেকে উদয়-অস্ত গুহায় বসে তিনি আঁকতেন, গ্যাস-বাতী জ্বেলে আহারের পর রাত্র ৮টা পর্যন্ত বসে বসে চান্‌কে তুলতেন।

আমাদের এই অজন্তার ছবির নকলের কাজ চলেছিল ১৯০৯-১০ এবং ১৯১০-১১ শীতকালে এবং ছবিগুলি অবশেষে বিলাতের South Kensington Museumএর Indian Sectionএ আর অল্প কিছুটা পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথের সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল। ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকেদের নিকট অজন্তা তখন ছিল অজান্তা—আমরাই তার প্রথম প্রচার করি সর্বসাধারণের সমক্ষে। গ্রীফিথ্‌সের নকলকরা অজন্তার ছবির খবর কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্ববিদরাই তখন জানতেন। Lady Herringhamএর Partfolio Edition অজন্তার বই Indian Society—লণ্ডন থেকে প্রথম প্রকাশ করে। অজন্তায় আমাদের কাজ করতে হ'ত সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা এবং তারপর তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম ও আহারের পর রাত্র ১২টা পর্যন্ত tracing প্রভৃতি কাজ করে হ'ত। লেডি হেরিংহামও বৃদ্ধবয়সে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করতেন। তার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই কারণে অজন্তার বইটিতে আমাদের আঁকা বহু ছবি বিলাতি মহিলা আর্টিষ্টদের নামে উল্লেখিত হয়েচে। তাছাড়া এখন অজন্তার চিত্রাবলী নকলের ইতিহাসেও দেখচি কেবল লেডি হেরিংহামেরই নামের উল্লেখ হয়। লেডি হেরিংহাম নিজে আমাদের কাজের বিষয় বহু বিলাতি পত্রিকায় তখন উল্লেখ করেছিলেন। আমাদের পক্ষে অজন্তা শৈলীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় পাওয়ার সুযোগ হওয়ায় আমাদের দেশী আর্টকে বোঝার জন্য তৃতীয় নয়ন খুলে গিয়েছিল। মানস-পরিকল্পিত অথচ গ্যাটার্নের মত conventional না করে, জীবনের সকল রস-ভাবকে পরিবেশিত করার শক্তি অজন্তার চিত্রকলার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম। যেমন কালিদাসের মহাকাব্য তেমনি অজন্তার চিত্রকলা। এদের নিকটে দাঁড়িয়ে অন্য দিকে আর দৃষ্টি ফেরাতে কখনই ইচ্ছা হয়নি। নয়শত বৎসরের ধারাবাহিক শিল্পকলার ক্রমসূচী এই অজন্তার ২৯টি গুহায় আজও প্রাণবন্ত। আমাদের দেশ আর্টের ক্ষেত্রে দীন নয় বরং ঐশ্বর্যশালী সেই কথাই প্রবলভাবে আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছিল। যেমন আমাদের আগেকার দেশী শিল্পীরা বিলাতী realistic চিত্রকলার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিলেন, আবার এখন একালে দেখচি আবার আমাদের তরুণ শিল্পীরা উরোপের নবপ্রবর্ত্তিত সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকলার অনুকরণে মন দিয়েচেন। কিন্তু আমাদের মনে আজও সেই অজন্তা শৈলীর ঐশ্বর্য্য জাগরূক থাকায় পথভ্রষ্ট হতে দেয়নি।

অজন্তা থেকে প্রথম বৎসর ১৯০৯ ফেরার অব্যবহিত পরেই আমার মাতামহীর ছোট ভগ্নী ভারতী সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী (নদিদি) আমাকে আদেশ করলেন অজন্তার বর্ণনা ভারতী পত্রিকার জন্য লিখতে। আমি নিজের মনে চলিত ভাষায় (যথাসম্ভব তখনকার প্রচলিত কেতাব ভাষা বাদ

দিয়ে) গুহাচিত্রাবলী এবং পথের বর্ণনা লিখলাম (ভারতী কার্ত্তিক, ১৩১৭ এবং ভারতী পৌষ, ১৩১৯)। চলিত বাঙলা ভাষা তখন সাহিত্যে ছিল অচল। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আমার ভাষাকে গুরুচণ্ডালি দোষদুষ্ট বল্লেন। কিন্তু মহাকবি রবিদাদা এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ তিনভাই,—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমার চলিত ভাষায় লেখা অজন্তার উপর প্রবন্ধ পাঠে আমাকে খুব উৎসাহিত করলেন। মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বল্লেন, "অসিত, তোর ভাষা আমার খুব ভাল লেগেচে আমিও চলিত ভাষায় ভারতীতে বম্বে প্রবাসের কথা লিখচি।" তারপর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটল যার পর থেকে বাঙলা গদ্য ভাষার মোড় ফিরল চলিত ভাষার দিকে। "ঢাকারিভিউ" ইংরাজী ও বাঙলায় প্রকাশিত একটি পত্রিকা বাবা পেতেন ঢাকা থেকে। তাতে মেজদাদার ভারতী পত্রিকায় লেখা বম্বে প্রবাসের প্রবন্ধটির ভাষা নিয়ে একটি সমালোচনা বেরিয়েছিল। যতদূর আমার মনে আছে তাতে লেখা ছিল: "স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভারতী পত্রিকায় প্রাদেশিকতা রক্ষা করে যে চলিত ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে দেশের সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হইবে"—ইত্যাদি। আমাদের রাঁচির বাড়ীতে পিতাঠাকুর একদিন মেজদাদা মহাশয়কে সেই সমালোচনাটি দেখালেন—সেই সময় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অতঃপর তার উত্তরে "বাঙ্গলা ভাষা বনাম সাধুভাষা" নামে ভারতীতে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন চলিত ভাষায়। এইভাবে ক্রমশ শক্তিশালী সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারাই খাঁটি চলিত বাঙলা সচল হয়ে উঠ্‌ল। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' আজও তার সাক্ষ্য দিচ্চে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথও সেই পথই অবলম্বন করলেন গদ্যসাহিত্যে। আমি রইলাম নিমিত্তের ভাগী হয়ে। নাটকের সূত্রধারের মতই পটযবনিকার পর পটযবনিকা উঠল পড়ল কিন্তু সূত্রধারের আর খোঁজ কেইবা করে?

কলকাতার আকাশের তারা

বটকৃষ্ণ দে

কলকাতার আকাশে তো সে তারাকে কখনো দেখি না,
যার স্থির দৃষ্টিদীপ স্বামী-স্ত্রী-র সুখশয্যাসীনা
কানে-কানে আলাপের মতো জাগে। আবেগে উত্তাপে
পদ্মকলি চোখ যার ভ্রমরের প্রেমের সংলাপে
বাসর-রাত্রির স্বপ্নে মধুর-মুখর। সেই স্বর
কলকাতার ত্রস্ত কানে আসে-ও না। চোখের উপর
মমতার দিব্য জ্যোতি শান্তির শিশিরে ঝরে নি তো,—
কলকাতার মন, সেতো আপন রূপেই অন্ধ, মৃত!

মনে পড়ে? বৃত্ত-এঁকে-বসা সেই ঠাকুমার শ্লোক-বলা সাঁঝে
বকুল ডালের ফাঁকে উঁকি-দেওয়া কী যে তারা, তার নামে কতো
উপাখ্যান, কে যেনো সে, ম'রে গিয়ে প্রেমিকের দৃষ্টিতে শাশ্বত
হ'তে চেয়ে তারা হ'ল,—তবে, প্রেম-ই বুঝি আকাশের তারা সাজে?

সাজুক। হে কলকাতা, হে আকাশ, তুমি তো দেখেছ,
জেনেছ আমার প্রেম। তুমি তার আলো নিভিয়েছ।
আমি তবে ম'রে গিয়ে কার কথা ভেবে, হবো, বলো,
কলকাতার আকাশের অদেখা তারায় ছলোছলো?

পুতুল প্রেমিক কন্যা

শংকর চট্টোপাধ্যায়

থুথুরে পাকা শীতের হাওয়ায় বুড়ো জারুলের ডালে
যে গান থেমেছে, সেই গান যদি আবার কখনো আনে
মৌ মৌ মন, তাহলে এমন
জংধরা কলকাতা, ফিরে পেতে পারে
বসন্ত দিন, গানে ভরা নীল খাতা
ঘন আঙুলের চকিত চমকে মলিন গলির ব্যথা
ভোলাবে হয়ত, রুক্ষ পথের ধূলাতে
কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম প্রেম দুহাতে।

কোথায় কখনও ম্লান সিড়ি ভরা ছায়াতে
সে কান পেতেছে, পুতুল প্রেমিক কন্যা
আশার ঝিনুকে ব্যাথার অশ্রু তার না
হেনোনা, কঠিন করুণ হৃদয়ে তীর তো
যদি পথ ভুলে রাঙা বন্দরে বেনামী জাহাজ ভিড়তো।

কান্নায় তার মন এলোমেলো—উধাও
ব্যাকুল বকুল ঝরেছে অন্ধ খোঁপাতে
বাউল বাতাসে শিশিরের ডানা ব্যাকুল
ভুল বুঝে তুমি আঙুল বাড়ালে বকুল।

আর না, আর না, মিথ্যের ছলে ত্রসোনা
থুথুরে হাওয়া, গলির আকাশে হেনোনা
নির্ভুল তীর, এ সহরে মুখোমুখি
কন্যার চোখে কান্নার পাশে সুখ-ই।

কান্না

শিবশম্ভু পাল

তোমার কান্নার ধারা কখনো ঝরেছে
ঝরানো পাতার মত, আবার কখনো অপ্রকাশ ;
অবরুদ্ধ বেদনায় জড়িয়ে পড়েছে
তোমার হৃদয়, মন, হৃদয়ের যাকিছু উচ্ছ্বাস
কোথায় মিলেছে তা কে জানে ;
তুমিতো খুঁজেছ তাকে তোমার বিশ্বের সবখানে ॥

বেদনার মাঝে নেই মধুরের অনুত্তম সুর,
রোদনে তাইতো কই মুক্তোর প্রদীপ্ত প্রতিভাস।
দুঃখের তিমিরে শুধু প্রত্যহের কামনা ভঙ্গুর,
তোমার কান্নায় তাই ব্যর্থতার অসহ বিন্যাস।

পাওনি, পাওনি খুঁজে হৃদয়ের হারানো সঙ্গীত
যেখানে আমার আমি রণিত, ধ্বনিত মীড়ে মীড়ে ;
তারি শোক ক্লান্ত মুখে সকরুণ, তোমার সম্বিৎ
স্বপ্নমৌন পৃথিবীর জীবনের শীর্ণনদী তীরে।

কান্নার সমাপ্তি হবে কান্নাতেই শেষে
প্রত্যহের রুদ্রমুখ পৃথিবীর অমোঘ নির্দ্দেশে ॥

আজ দিন

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

পায়ের মাটিতে চিড়। সময়কে ঠিক মেনে নেয়া
হয়তো যাবেনা আজ ; তবু, সুচেতনা, তুমি জানো—
আমার সংকল্প কিছু সহসাই নয়তো বানানো।
তোমাকে আমাকে নিয়ে একদা স্বপ্নের ইন্দ্রধনু
রচিতে চাইনা, চাই সাজাতে তোমার বরতনু
ঘাসরঙ শাড়ী দিয়ে, মালা গেঁথে মালতী কি কেয়া,
গলায় খোঁপায় দেবো ; তারই সাথে আমার হৃদয়
উপহার দিয়ে, নেবো আরো প্রেম—গভীর বিস্ময়।
ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আশা—আকাঙ্খার অনির্ণেয় ঋণ
তোমার আমার মাঝে জমা হবে তবু প্রতিদিন।

যতো শোধ হবে ঋণ, বোধ হবে : জগতের হাতে
চিন্তার কুসুমগুলি তুলে দেবো উজ্জ্বল প্রভাতে।
যে-পৃথিবী ভাঙে, গড়ে—ফিরে দেয় নোতুন জীবন
সেখানেই সময়ের নদী-মুখে আছে তো নির্জন
কোনো দ্বীপ। না-থাকে আমরা জন-সমুদ্রেরই বুকে
হৃদয় মেলাবো, পাবো জীবনকে মৃত্যুত্তীর্ণ সুখে,
নক্ষত্রের আলো থেকে এ-মাটির অগাধ বিস্তারে।
সুচেতনা, আমরা যে সংকটের শিখর কিনারে।

হাস্‌নুহানা রাত

দেবপ্রসাদ ঘোষ

সে-কথার অনুরসে জাল বুনি এ-বিদগ্ধ প্রহর কাটাতে
বিস্ময়ের গর্ভ থেকে আশ্বাসের হাস্‌নুহানা রাতে।
অপলাপী হৃদয়ের প্রসাদ প্রার্থনা,
কে যেন অলক্ষে বলে—মন তুমি শুননা শুননা।

আজ এই অন্ধগর্ভে সব লগ্ন হলে অপগত
স্নিগ্ধ কোনো সুরভিত সকালের মত,
বিস্মৃতির জতুগৃহে সব স্মৃতি, সব পরিচয়,
তবুও স্তিমিত দীপে প্রজ্জ্বলিত ম্লান সংশয়
নিরাকার ছায়া ফেলে প্রাত্যহিক প্রত্যয়ের ঘরে,
শরীর ছড়িয়ে রাখি অপেক্ষার বিস্তৃত চাদরে।

নিঝুম নিশুতি রাতে এঁকে বেঁকে রোজ
কি জানি কেন সে আসে—কার নিতে খোঁজ
আমি চাই, ওই দূরে ক্ষীণ-নীবি অভিসারী চাঁদ,
আমার শিয়রে জাগে কি সুষম হাস্‌নুহানা রাত!
চোখ বুজি। বিস্ময়ের আবরণ চিরে
অবগাহনের মোহ আকাঙ্ক্ষার অলস সমীরে।

গোধূলি

ডি এইচ লরেন্স

এসেছে গোধূলি—
ঘন সন্ধ্যার আবছায়া।
রচি শব্দের মায়া
চলে লুকনো কণ্ঠধ্বনি
বিরামবিহীন নিঠুরপরাণী
জলের ধারার মতো।
ডুবায়ে পাথরগুলি
আঁধার বহে যায় মাঝ দিয়া,
পাথরের তলে ছিটায়ে তপ্ত স্রোত॥

অনুবাদ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌদামিনীর পূজা

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে, সৌদামিনী খুব ঘটা করে পুজো করছে। বাসন্তী পুজো। বিপুল সমারোহ। গাঁয়ের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, ব্রাহ্মণ থেকে বাগ্‌দী পর্য্যন্ত সর্বত্র ঐ এক কথা—সৌদামিনীর পুজো।

সৌদামিনী এ গাঁয়ের বধূ নয়, মেয়ে। যাত্রাপুরের প্রৌঢ় জমিদার ও ব্যবসায়ী বিপুল ধনী জগবন্ধু রায়ের তরুণী ভার্য্যা সৌদামিনী। সরযুনো পরগনাটি বেবাক জগবন্ধু রায়ের জমিদারি। কলকাতায় চীৎপুরে বাঁশের আর জ্বালানির প্রকাণ্ড ব্যবসায়। সৌদামিনীর পিতা গাঁয়ে পাটের আড়তদারি করে চটকের থেকে চটকে উঠছিলেন, এমনি সময়ে হঠাৎ চোখ বুজলেন।—সৌদামিনীর মা অন্ধকার দেখলেন। সে অন্ধকার আর ঘুচল না। দেনার দায়ে সর্বস্ব গেল। অর্ধসমাপ্ত পাকা বাড়ী আর পুজার মণ্ডপবাড়ীর বিকট দেয়ালগুলি কঠিন বিদ্রূপ বিস্তার করে সৌদামিনীর মায়ের আর সৌদামিনীর বুকের উপর খাড়া হয়ে রইল। গাঁয়ের মানুষ আত্মীয় অনাত্মীয় নির্বিশেষে আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। নিরুপায় বিধবা নিদারুণ বিধাতার কাছে মাথা কুটতে লাগলেন। বিধাতা আবার একবার তাঁর লীলাকৌতুক দৃষ্টি হানলেন। সদ্য বিপত্নীক নিঃসন্তান জগবন্ধু রায় তখন একদিন তাঁর নৌকো থেকে নদীর খিড়কির ঘাটে স্নানরতা যৌবনবিচ্ছুরিতা সৌদামিনীর ঝিলিক দেখলেন। সেইদিনই তত্ত্বতল্লাস নিয়ে শুভকর্মের প্রস্তাব করেন বিধবা মায়ের কাছে। সৌদামিনী তার মায়ের দ্বিধা জোরের সঙ্গে সরিয়ে তাঁকে রাজী করাল। সৌদামিনী এখন বিখ্যাত ধনাঢ্য জমিদার জগবন্ধু রায়ের পতিভক্ত উপযুক্ত গৃহিনী। কলিকাতাবাসিনী। দেশেও আসে যায়। দেশের হাজার হাজার প্রজা কলকাতার শত শত আশ্রিত তার নামে মাথা অবনত করছে।

আমার ভারি অবাক লাগে। তার এই বয়েসে সৌদামিনী কেমন করে এমন জাঁকালো প্রজাবৎসলা আশ্রয়দাত্রী করুণাময়ী রাণীমা হয়ে উঠল। অনেকদিন তাকে দেখিনি বটে। তবু সে এমন কিছু বিশ বছর নয়। সৌদামিনীর ক্রিয়াকলাপ ভাবজগতের যতটুকু দেখা যায় বা ভেসে আসে তাতে আমার হাসি পায়, বিস্ময় জাগে।

গাঁয়ের আর পাঁচজন সমবয়সীর মত আমিও সৌদামিনীর বাল্যসাথী ছিলাম। তাদেরই মত আমিওওর সঙ্গে একসাথে এক পাঠশালায় পড়েছি। একসাথে নদীতে ঝাঁপিয়েছি, একসঙ্গে গাছে উঠেছি একসঙ্গে তিরস্কার মার খেয়েছি। সৌদামিনীর স্বভাবে এক সদ্দারি ভাব ছিল। ও হুকুম করবে চালনা করবে, ওকে মানতে হবে। নইলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। এ নিয়ে ওর যা কিছু প্রতিযোগিতা তা কানাইয়ের সঙ্গে ছিল। আমরা আর কেউ সে দুঃসাহসিকতা করিনি। আমি ত বশম্বদতম ছিলাম।

ও তখন খুকিটি নয়, সুশো জেলের দিদি সাতীর সঙ্গে পাটের নাচনা নাচছে। দুই সতীনের ঝগড়া। আফা বাজাদার ঢাক বাজাচ্ছে, সৌদামিনী সাথীর সাথে সাথে বাজনার তালে তালে কখন সতীনের চুল ছিঁড়ছে, কখন তার নাক কাটছে কান কাটছে, শিল নোড়া দিয়ে একটি একটি করে দাঁত ভাঙছে। আর প্রতিটি নির্য্যাতনের পরে বাজনার সাথে নির্ম্মম সুন্দর পদাঘাত করে নূতন শান্তির অবতারণা করছে। কানাই বাহবা দিচ্ছে, বা রে সদু, ঘুরে ফিরে। সে নৃত্যের শেষে চৌদুনি লয়ে কল্পিত ভূলুণ্ঠিত সতীনের দেহে পদাঘাতে সুন্দর তেহাই দিয়ে সেই দেহোপরি বিজয়িনীর দৃপ্তভংগীতে দাঁড়াল।

এই ত যেন সেদিনের কথা। যেন চোখের উপর ভাসছে। শিবতলার রাস্তায় ফিরতে ফিরতে মৃদুস্বরে সৌদামিনী আমাকে জিজ্ঞেস করছে, কার নাচ্‌না ভাল হল, সাতীর না তার। যেন কানে শুনছি।

আজ আমি সৌদামিনীর থেকে অনেক দূরে।—তখনও তার সাথী হলেও খুব কাছাকাছি স্থান তার কাছে আমার ছিল না। কানাই, অমূল্য, সুরো, বাণী আমার চাইতে অনেক বেশী কাছাকাছি ছিল তার। আমি তাদের চাইতে সমস্ত বিষয়ে অনেক অপটু। আমাকে নিয়ে সৌদামিনীর ফ্যাসাদের অন্ত ছিল না। তবু সৌদামিনী আমাকে ঠেলতে পারত না। আমি সৌদামিনীর চেয়েও দেখতে সুন্দর ছিলাম। সৌদামিনী সর্ব্ববিষয়ে আত্মসচেতন বরাবর। আমার দৈহিক সৌন্দর্য্য অপাত্রে ন্যস্ত, বিধাতার অবিচার মনে করত। আমি বিধাতার একটি প্রবঞ্চনা। মুরোদ নেই, সুরৎ আছে। সেই কথাটায় আমাকে বিদ্ধ করতে আমাকে 'রাঙামুলো' 'মাকাল' বলে ডাকত। শেষ পর্য্যন্ত মাকাল বেছে নিল। প্রথম প্রথম সকলে হাসত, আমি আপত্তি করতাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সৌদামিনী মাকাল সম্বোধনে টিকে রইল। আমি বুঝতাম সৌদামিনী আমাকে ঠেলতে ফেলতে পারে না। সৌদামিনীর আমার জন্য দুর্বলতা আছে।

নতেল পড়া নিষিদ্ধ ফলের তখন আমরা গোপন আস্বাদন সুরু করেছি। পদ্মাবৌদির নিভৃত ঘরে দুপুর বেলায় পাশ বালিশে মাথা দিয়ে তিনজনে পাশাপাশি শুয়েছি। মাঝখানে সৌদামিনী বুকের ওপর দুর্গেশনন্দিনী রেখে হু হু করে পড়ে চলেছে। আয়েষা অসংকোচে বলল এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর। সৌদামিনী থেমে গেল। পদ্মাবৌদি যেন সাবাস দিল। সৌদামিনী পদ্মাবৌদি দুজনেই খুব একটা রস পেয়েছে, আয়েষা বড় রকমের একটা কিছু বলেছে বোঝা গেল। কিন্তু ঠিক কি বুঝতে না পেরে সৌদামিনীকে জিজ্ঞেস করি, প্রাণেশ্বর কি। সৌদামিনী হো হো করে হেসে উঠে, পরক্ষণেই বই দিয়ে আমার নাকের ডগায় আঘাত করে বলেছিল, বৌ এসে বুঝিয়ে দেবে। নাকে আমার বেশ লেগেছিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মুহূর্ত্তকাল একটু কান পেতে থেকে, লাফ দিয়ে উঠে আমার ডান হাতে টান মেরে বলল, শীগগীর ইষ্টিমার। আমার হাত ধরে এরকম আমাকে টেনে দিয়ে দৌড়ে নদীর ঘাটে উপস্থিত হল! আপ্‌ যাত্রী ষ্টিমার সবে বাঁক ঘুরেছে। একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়ালাম, সৌদামিনী হাঁটুর উপরে শাড়ি টেনে নিয়েছে—ঢেউ খেতে। ভুমুল শব্দ করে অনেকখানি ঢেউ তুলে সামনে দিয়ে ষ্টিমার চলে গেল। একটু পরে ঢেউ এসে ছলাৎ ছলাৎ করে

আমাদের পা বেয়ে অনেকখানি উঠল। আমার কাপড় ভিজল, সৌদামিনীর মত আমি সামলাতে পারি নি।

সৌদামিনীকে নিয়ে ওর মা বাপের স্বস্তি ছিল না। একটা না একটা কাণ্ড লেগেই আছে। যত বড় হচ্ছে ততই তা বাড়ছে। ও কানাইয়ের বাড়ীতে কানাইয়ের মায়ের হাতে তেঁতুল কাঁচা লংকা দিয়ে ফেনভাত খেয়েছে, বংকা নাপিতের বাড়ী পিঠে খেয়েছে, এমন কি সুশো জেলের বাড়ী চিড়ে মুড়কি নয় শুধু তার সঙ্গে জল পর্য্যন্ত খেয়েছে। একটা কিছু সামাজিক গোলমাল ঘটতে পারে নি তার কারণ ওর বাপের তখন পাটের আড়তে বাড়বাড়ন্ত সময়। এসবের চাইতেও গুরুতর অপরাধ সৌদামিনীর আছে। সে ব্রাহ্মণকন্যা হয়েও আমার ব্রাহ্মণ্যে একটি ক্ষুদ্র আঁচড় কেটেছিল। অনেকদিন আমার মনে তা খচ্‌খচ্‌ করেছে। আমার উপনয়ন উৎসব চলেছে, খুব বিরাট কিছু না হলেও, নিতান্ত কমও কিছু নয়। সৌদামিনী খুব খানিকটে জায়গা জুড়েছে তার মাঝে, তার কর্ম্ম-দক্ষতায় আমি ব্রহ্মচারী—তিনদিন তিনরাতের মত দোতালার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ। একবেলা হবিষ্যান্ন আহার অর্থাৎ প্রায় উপবাস, জানালা দরজা রুদ্ধ, বাক্যালাপ বন্ধ। এমন কি মা ও মাতৃ-স্থানীয়া ব্যতীত কোনও নারীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। বিশেষত কুমারীর। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে কিছুক্ষণ, বাইরে উৎসবের স্রোত বইছে, যাত্রাগান সুরু হয়ে গেছে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ সৌদামিনী ঘরে ঢুকল। ঠক্‌ করে ডানহাতের জলের গ্লাস নামিয়ে সেই হাতে রেকাবীখানা আমার সামনে ধরে চাপা স্বরে বলল, নারায়ণের ভোগ প্রসাদ, চট্‌ করে খেয়ে ফেলো, এতে দোষ হবে না।

সৌদামিনী উৎসবের বেশে সজ্জিতা, ঝিলমিল করছে। আমি অবাক হয়ে গেছি। বাঁ হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, চট করে খেয়ে নে ভাই, কেউ এসে পড়বে।

আমি চম্‌কে তার হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়িয়ে বললাম, সদু, সর্বনাশ, আমার পৈতে নষ্ট হয়ে যাবে। বেরো শীগগীর। এক রকম জোর করে তাকে বের করে দি। সেও কম অবাক হয়নি। যেতে যেতে ফিস্‌ ফিস্‌ গর্জ্জন করে বলেছিল, সবতাতে বাড়াবাড়ি, আজুড়ে ভট্‌চায্‌পনা।

সৌদামিনী তখন ছোটটিটি নয়। পূর্ব্বাকাশে উষার প্রথম কিরণপাতের মত তার দেহে তখন প্রথম যৌবনের রক্তিম আভা লেগেছে।

মনে হচ্ছে এই ত সেদিনের কথা। আমার বিলম্বিত উপনয়ন, আমিও তখন ছোটটি নই। সৌদামিনী আমার নূতন নাম করণ করল, ভট্‌চায্‌।

এরপরে সৌদামিনীর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ বিরল হতে বিরলতর হয়ে আসে। তার অসামান্য বিয়ের সময়ে আমি কলকাতার কলেজে। বিয়ের পরে এই গ্রাম সৌদামিনী যেন ভেঙ্গে নূতন করে গড়ে সাজিয়ে দিয়েছে। প্রকাণ্ড পাকা স্কুলবাড়ী, ডাক্তারখানা, বাজার, রাস্তাঘাট। দশপা হাঁটতে মস্ত একটা কিছুর ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা "জগবন্ধু" একটা কিছু। সৌদামিনীর গাঁয়ের প্রতি ভালবাসা আর সাথীর প্রতি উক্তির নামাবলী যেন গাঁখানির গায়ে জড়ানো। নিজের বাপের বাড়ীর পূজো বাড়ীটা সব শেষে সমাপ্ত করেছে। সেই নূতন-করা পুরানো পূজোবাড়ীতে

এই নূতন পূজা করছে সৌদামিনী। গ্রামের প্রায় সমস্ত কর্ম্মক্ষম নিষ্কর্ম্মা ও অকর্ম্মণ্যদের কোনও না কোনও হিল্লে করে দিয়েছে।

তাই সেদিনের সৌদামিনী এরই মাঝে এতবড় একটি ব্যাপার। তার আগমনে তার পূজার আসন্ন সম্ভাবনায় সমস্ত গ্রাম স্পন্দিত। আমিও ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন একটু স্পন্দন অনুভব করছি। সৌদামিনীর প্রতি আমারও কোথায় দুর্ব্বলতা ছিল। এখনও আছে নাকি!

সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুরঘরে মধুসূদন পাণ্ডা বৈকালী দিচ্ছে, ঘণ্টা বাজছে। ভেতরে সমস্ত নিস্তব্ধ। মা পিসিমা ঠাকুরঘরে, বৈকালীর যোগাড় দিচ্ছেন, বিনির আঁচ পাওয়া যাচ্ছে না। একটু আগে নোটীশ দিয়ে গেছে—তোমার সন্ধ্যে আহ্নিক টাহ্নিক সেরে নাও দাদা।

উঠি উঠি করছি, একটি সুস্পষ্ট সম্বোধন কানে এল, কাকীমা! ও কাকীমা!

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। তার ধ্বনিটি পুরাতন, ভংগিটি নূতন।

সৌদামিনী। মাকে ডাকছে।

বিনি ব্যস্ত হয়ে কলকণ্ঠে সম্বধনা করছে, মাকে ডাকছে, পিসিমাকে ডাকছে, বসতে বলছে, কুশল প্রশ্ন করছে।

সৌদামিনী প্রশ্ন করল, তোর দাদা কোথায় রে বিনু?

ওপরে, ডাকি। দা—দা।

মা পিসিমা ব্যস্ত হয়ে এলেন; মধুসূদন ছুটে এসে আশীর্ব্বাদের ঢেউ তুলে দিল। আরও পাঁচজন ব্যস্ত হয়ে এল।

মহীয়সী সৌদামিনী স্বয়ং এসেছে। অপ্রত্যাশিত নয়, অস্বাভাবিক ত নয়ই, তবু যেন পরমাশ্চর্য্য।

উপরে নিভৃত কক্ষে বসে বিস্ময় লাগে। সেই সৌদামিনী আজ এতখানি!

নীচে কলকণ্ঠে কি একটা উৎসাহিত আলোচনা হচ্ছে, খাসা হবে, সুন্দর হবে। খোলা জানালা দিয়ে অন্যমনে নদীর ঘাটের বটগাছের মাথার শেষ চিকচিকের দিকে তাকিয়ে আছি, ঘনায়মান সন্ধ্যার ক্রমবর্ধমান ছায়া যেন মনের উপর বিস্তৃত হচ্ছে, একটি মৃদু সম্বোধন হল—ভট্‌চায্‌।

সৌদামিনী কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে।

—এতক্ষণ নীচে চেঁচামেচি ডাকাডাকি করছি, বাবুর যে সাড়াই নেই। কার ধ্যান করছ সন্ধ্যাকালে একা একা এই ঘরে বসে?

কণ্ঠে প্রশ্রয় মিশ্রিত ধমক, বাচনভংগিতে সন্দারি। আজকের সৌদামিনীকে সৌদামিনীর নিজের কাছে যেন লজ্জা করছে, সংকোচ হচ্ছে। পুরাতন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়।

সৌদামিনীকে পরমাশ্চর্য্য লাগছে। সে সেই সৌদামিনী, না রাজেন্দ্রাণী। সে আশ্চর্য্য সুন্দর। দেহের পরিপূর্ণতায়, বর্ণচ্ছটায়, চুলের কালোয়, চোখের গভীর অথচ সকৌতুক দৃষ্টিতে বেশের অলংকারের বৈশিষ্ট্যে সৌদামিনী যেন একটি মহিমা। তার রাণীর ম্যাজেষ্টি।

বললাম, বোস সদু। এই কাঠের ওপরই বোস, সিংহাসন ত নেই।

সৌদামিনী টেবিলের সামনের চেয়ারখানা ঘড়াৎ করে ঘুরিয়ে নিয়ে তাতে বসে বলল, রাগিয়ো না বলছি, ভট্‌চায্‌।

বললাম, সদু, কি খবর?

—খবর ত খুব নাও। বারোমাস কলকাতায় আছ, রোজ খবর নিচ্ছ। কলেজে আর ত কেউ প্রফেসারি করে না, এক তুমিই কর।

—ঝগড়া করতে এলি?

সৌদামিনী গলা নামিয়ে মিনতির সুরে বলল, না, খোসামোদ করতে এসেছি। পুরুত হতে হবে, আমার পুজো করে দিতে হবে। দিবি নে ভাই?

—কেন তোদের বংশী কি হল?

—বংশীকে দিয়ে পুজো করা যায়! যা তা করছে! সাতীকে ত এখন বাড়ী তুলেছে। তুই ত কোনও খবর রাখিস নে। চাবুকে বের করে দিতাম গাঁ থেকে, শুধু সাতীর মুখ চেয়ে দি না।

—যাত্রাপুর থেকে তোর পুরুত আনা না।

—আহা, বাপের বাড়ী আমার পুজো, শ্বশুরবাড়ীর পুরোত। গলায় দড়ি।

—আমি ত পুজো করি নে, জানি ত না।

—ওরে ছেলে। তুমি কলেজে পুজো করতে পার, এখানে ইস্কুলে পুজো করতে পার, আর আমার পুজোর বেলায় জান না? যদি রাজী না হও আমি কুরুক্ষেত্তর বাঁধিয়ে দেব, বলছি।

বলেই উঠে দাঁড়াল। যেন তখনি একটা কিছু করে বসবে।

সেই সৌদামিনী। বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ করছে। ভারি ভাল লাগল। কোথায় যেন ওর জোর এসে লাগছে।

অহঙ্কার দিয়ে বলল, আমি একুণি সব চিত্রায় ফেলে দেব। দেখবে? হেসে বললাম, সে তুমি পার। আর দেখাতে হবে না।

—রাজী?

—আচ্ছা। খুব ত ধুম করছিস। দক্ষিণে কি দিবি পুরুতকে?

সৌদামিনী তার আরক্ত কালো আশ্চর্য্য দুটি চোখ মুহূর্ত্ত কাল আমার চোখে নিবদ্ধ করে একটি চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে বলল, কি বা দিতে পারি। দেবার মত আর কি আছে?

আমি ক্ষণকাল চুপ করে থেকে হালকা সুরে বললাম, ও মেয়ে, দক্ষিণের বেলায় ফাঁকি! তা হচ্ছে না।

সৌদামিনী স্তব্ধ হয়ে রইল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চললাম, কাকীমা ডাকছেন। নীচে অনেকে জড় হয়েছে।

আজ পুজো। সকালে সৌদামিনীদের বাড়ীতে গেলাম।

সত্যই রাজকীয় সমারোহের ব্যাপার। অনেক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। অনেক কিছু তখনও

চলেছে। বারবাড়ীর সমস্ত উঠোন জুড়ে প্রকাণ্ড সুন্দর সামিয়ানা। মণ্ডপবাড়ী ফুলে পাতায়, রঙিন কাপড়ে কাগজে, ঝাড়ে বাতিতে, চন্দ্রাতপে ঝালরে অপরূপ সজ্জিত। সামনের বৈঠকখানা দালানে সারিবদ্ধ তক্তপোষের উপর ধবধবে ফরাস, বারান্দায় বেঞ্চি চেয়ার। পূবের পেটকাটা লম্বা ঘরের একদিকে অসংখ্য বাজাদার, ঢাক ঢোল, নাগরা টিকেরা সাজানো। সানাই সুর ধরেছে। সৌদামিনীর আমলা কর্মচারি দারোয়ান পাইক, চাকর দাসী, আশ্রিতে অনুগৃহীতে সমস্ত বাড়ী যেন ঠাসা। গাঁয়ের এপাড়া ওপাড়া ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে মুরুব্বি আধা-মুরুব্বি সকলে হাজির। একদিকে স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। সেখানে গাঁয়ের কলেজী ছাত্রেরা ব্যস্ত। যাত্রার পর থিয়েটার হবে।

ভেতরে গেলাম। সমস্ত উত্তর দিক জুড়ে লম্বা ছাব্‌ড়া। সারি সারি ভিয়েনদার খাদ্য প্রস্তুত করছে। পাহাড় প্রধাণ নানা তরকারি, স্তূপীকৃত মাছ, বস্তা বস্তা ময়দা, গাদা গাদা স্ত্রী পুরুষ। হৈ হৈ ডাকাডাকি দৌড়দৌড়ি। সমস্ত বাড়ী যেন গমগম করছে এরই মধ্যে।

সৌদামিনী খুসীতে ফেটে পড়ে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করল, এলে? আমি ত ভেবেই মরছিলাম।

সৌদামিনীর আশে পাশে বহু নারী। তাদের পেছন থেকে তার মা বললেন, ও সদু। পুরুতের পা ধুইয়ে, প্রণাম করে ঘরে তুলতে হয় যে।

—ওমা, তাই নাকি। সাবি, আন ত জল এক ঘটি।

মস্ত একটা রূপার ঘটিতে জল এলে ঝির হাত থেকে সেটা নিয়ে আমি কিছু বলবার আগেই হেঁট হয়ে আমার দুই পায়ে হুড় হুড় করে ঢেলে দিয়ে আমার সিক্ত পদে তার ডান হাত বুলিয়ে টিপ করে প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখ টিপে হেসে ঘাড় নেড়ে জিজ্ঞেস করল, হয়েছে?

আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দুই তিনজন স্তবকারিণী একসঙ্গে গুঞ্জন করে উঠলো, বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। সৌদামিনীর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম, পুরোহিত বরণ, তার পুজোর সুরু ভাল হয়েছে।

সৌদামিনীর স্নান হয়ে গেছে। অর্ধসিক্ত কালো চুলের রাশি পিঠ ছাপিয়ে কোমর ছাড়িয়ে পড়েছে। খাসা একটা স্নিগ্ধ সৌরভ নিসৃত হচ্ছে। চওড়া লাল পাড় ধবধবে সাদা গরদের সাড়ি পরিধানে। কানে হীরের বেলফুলের কুঁড়ি। গরদের ব্লাউজের পাশ দিয়ে নীল মীনে-করা হার খানিকটে দেখা যাচ্ছে; হাতে পাঁচমিশেলী সোনার চুড়ি।

ভিতরে যেতে যেতে বললাম, নিজেই ত প্রতিমাটি হয়ে বসে আছ।

সৌদামিনী যেন চমকে উঠল। পরক্ষণে হাল্‌কা সুরে বলল, তাই নাকি? জিজ্ঞেস করল, ভট্‌চায্‌, স্নান সেরে এসেছিস্?

—এসেছি।

—চাটা একটু খেয়েছিস্?

—পুজোয় আমি ফাঁকি দি নে।

—সারাদিন নিরম্বু উপোষ!

গলা নামিয়ে বলল, একটু চা আমার ঘরে বসে খেয়ে নে। তাতে কিছু হবে না। চা খেয়ে নিলে অত কষ্ট হবে না।

—পাগল? তাই কি হয়?

সৌদামিনী খুঁত্‌ খুঁত্‌ করতে লাগল। আমি ধমক দিয়ে বললাম, চুপ্‌। সৌদামিনী তার ঘরে বসে আমায় তার পুজোর অনেক মূল্যবান উপকরণ দেখালে। ওদিকে হাঁক ডাক বাড়ছে, পুজোর সময় এসে উপস্থিত হল। পুরুতের ডাক পড়ছে। সৌদামিনী গোলাপী রংয়ের খাসা করে কুচনো চমৎকার বেনারসীর জোড় বার করে বলল, পুরুত ঠাকুর, পর। আপত্তি করে বললাম, আমি সঙ্‌ সেজে পুজো করতে পারব না। সৌদামিনী দুই চোখে অগ্নি হেনে বলল, পটবস্ত্র পরে পুজো করা সঙ্‌ সাজা? আমার পুজো খেলা, না? পর শীগগীর, নইলে এক্ষুণি আগুন ধরিয়ে দেব।

ওর গলা কথার সাথে সাথে চড়ছে। আমি আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে ওর হাত থেকে জোড় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

বেনারসী ধুতি চাদরে সজ্জিত হয়ে, বাঁ হাতে ভাঁজ করা নূতন লাল রংয়ের গামছা নিয়ে পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করলাম।

সম্মুখে ঘাটের পরে প্রকাণ্ড সুন্দর সুসজ্জিতা সালংকারা প্রতিমা তারপিন গর্জনে ঝক্‌ঝকে করছে। সামনে মস্ত পিড়ির উপর নক্‌সা করা দামী আসন। ডানপাশে অনতিদূরে তন্ত্রধারের অপেক্ষাকৃত ছোট আসন। দুইপাশে রূপার দণ্ডের পরে ঘৃত প্রদীপ। রাশিকৃত রক্ত ও নীল পদ্ম প্রকাণ্ড একটা কুড়িতে ঠাসা বোঝাই। প্রকাণ্ড তামার টাটের উপর স্তূপীকৃত ফুল বিল্বপত্র, শ্বেত রক্ত চন্দন। সারি সারি মাটীর রচনার হাড়ি, পিতলের রেকাবিতে নৈবেদ্য, গঙ্গামাটির উপর ঘট স্থাপিত। সমস্ত যেন গম্‌গম্‌ করছে। আমার বুকের মাঝে কেমন যেন দুর্‌ দুর্‌ করতে লাগল। এই পূজার আমি পুরোহিত। ইষ্টদেবকে স্মরণ করে আসন গ্রহণ করলাম। সুরু হল পূজা।

একাগ্রচিত্তে মন্ত্রপাঠ, অর্ঘ্যনিক্ষেপ, ঘণ্টাধ্বনি করে চলেছি। মাঝে মাঝে উপযুক্ত সময়ে অসংখ্য ঢাক ঢোল ঘণ্টা কাঁসর কাঁসর বেজে উঠছে। বাইরে বারান্দায় উঠানে অগণিত লোক অনুভব করছি। মাঝে মাঝে তুমুল ধ্বনি উঠছে, জয় মা। বাঁ দিকে অনতিদূরে বহু স্ত্রীলোকের উপস্থিতি, তাদের বসনের বিচিত্র রং টের পাচ্ছি। কিন্তু কিছুই আমার চৈতন্যে পুরোপুরি প্রবেশ করছে না। আমি সৌদামিনীর পুজোয় একাগ্রচিত্তে মন্ত্রের পর মন্ত্র পাঠ করে চলেছি। দুই পাশে দুইজন মণ্ডপী তন্ত্রধার পণ্ডিত মশায়ের নির্দেশমত কাজ করছে। এক সময়ে অনুভব করলাম আমার বামপাশে অনতিদূরে একটি উপস্থিতি, আঘ্রাণ করলাম একটি কেশের সৌরভ, দেখলাম পাঁচমিশেলী সোনার চুড়িসজ্জিত একখানি পদ্মহস্ত আমার পুষ্পপাত্রে কখনও বা ফুল, কখন বা চন্দন রাখছে আর আমার দেবীধ্যানমগ্ন, পূজাতন্ময় অন্তর একটি মাধুর্য্যে ভরে দিচ্ছে। কতক্ষণ কেটেছে, পূজার কোন পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছি খেয়াল নেই, একটি অর্ঘ্যপ্রদানের পর তন্ত্রধারের বাণী এল, ইতি পূজাশেষঃ। আরতি। সম্বিত পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁ দিকে তাকালাম, আমার আসন ঘেঁষে একটু পেছনে সৌদামিনী

উপবিষ্ট। আমার চোখের ওপর চোখ রেখে প্রসন্না দেবীর স্মিতহাসি হাসছে। পঞ্চপ্রদীপ হাতে নিয়ে আরতির জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

অঞ্জলি দেবার ডাক ছাড়ছে সতে মণ্ডপী। অনেকগুলি নারীর পুরোভাগে সৌদামিনী অঞ্জলি দিতে প্রবেশ করল। গাঢ় রাঙা বেনারসী সাড়ি পরণে, সোনালী লতাপাতা কারুকার্য্যে আগাগোড়া খচিত, এতখানি চওড়া আঁচলা সর্ব্বাংগে হীরে মুক্তো বসানো স্বর্ণালংকার। বিন্যস্ত পরিপাটি চুল, সিঁথিতে দীর্ঘ সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ সিঁদুর রেখা, কপালে সিঁদুরের যন্ত্রঅংকিত ফোঁটা। ভক্তি নম্রতায় যেন ঈষৎ অবনত। আমি তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করছি দেখে সে তেমনি মুখ টিপে একটু হাসল। আমার বাঁ পাশে অদূরে তার স্থান নির্দ্দেশিত হলে সে অপূর্ব্ব ভংগীতে বসল। নূতন সাড়ির আর তার প্রসাধনের সুরভিতে স্থানটি ভরে গেল। লাল বেনারসী সাড়ির পাশে গোলাপী বেনারসী ধুতি চাদর। পাশাপাশি। আমি স্পষ্ট দেখিলাম সৌদামিনী দুইয়ে মিলিয়ে দেখে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে অলক্ষ্যে একটু যেন হাসল। তার প্রসারিত দুই হস্তের অঞ্জলিতে চন্দনসিক্ত পদ্মফুল বিল্বপত্র ভরে দিয়ে বললাম, মন্ত্র পড়—

সে বদ্ধাঞ্জলি নতমুখে আমাকে অনুসরণ করে মৃদু মধুর অনুচ্চ স্পষ্ট স্বরে পাঠ করে চলল। হাতে ফুল বিল্বপত্র দিয়ে বললাম, প্রার্থনা কর, আয়ুর্দ্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতী দেহি মে।

সৌদামিনী 'ভাগ্যং' এর ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রপাঠ করে পুষ্পাঞ্জলি প্রতিমা পদে নিক্ষেপ করল।

অঞ্জলি শেষে সৌদামিনী সাষ্টাঙ্গে প্রতিমাকে প্রণাম করে তেমনি করে আমাকে প্রণাম করল। হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কি আশীর্ব্বাদ করব?

সৌদামিনী কথা বলে না, পেছন থেকে কোনও শুভাশুধ্যায়িনী বললেন, ছেলে হবার আশীর্ব্বাদ কর। তোমার মত দেখতে টুকটুকে সুন্দর ছেলে।

চণ্ডীপাঠ সেরে যখন উঠলাম, তখন সন্ধ্যা হতে আর বড় বেশী বাকি নেই।

সন্ধ্যারতি। আলোয় আলোয় মন্দিরের মাঝে যেন মধ্যাহ্নসূর্য্যের দীপ্তি। প্রতিমা থেকে যেন সহস্র ধারায় রশ্মির বান ছুটে আমাকে প্লাবিত করে দিচ্ছে। চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। বাঁ-দিকের বিস্তৃত সতরঞ্চের ওপর বহু পুণ্যার্থিনী নারী ঠাসাঠাসি করে বসে অনেক রংয়ের একটি মায়াজাল বিস্তার করেছে। তার মাঝখানে সামনে সেই লালে সোনালীতে বেনারসীর আভা একটি তন্বীর নড়াচড়ার সাথে সাথে মাঝে মাঝে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বাইরে বারান্দায় ঠাসা লোক। উঠোনে জনসমুদ্র। অসংখ্য ঢাক ঢোল কাঁসির বিপুল বাদ্যের তরংগে তালে তালে পঞ্চপ্রদীপ ধৃত আমার প্রসারিত বাহু আমার দেহ আরতির বিভিন্ন দোলনে দোলায়িত হচ্ছে। ধূপধূম্রচি, পঞ্চপ্রদীপ, রক্তজবা, কর্পূরাগ্নি—একের পর এক আরতি করে চলেছি। আমার বলিষ্ঠ দুই বাহু, ক্রমে সমস্ত দেহ ক্লান্তি থেকে ব্যথা, ব্যথা থেকে অবসন্নতায় এসে থেমে গেল। কোনও রকমে প্রণাম সেরে পূবের দেওয়ালের ধারে জানালার নীচের প্রতিমার পশ্চাতে পূজারী পুরোহিতের জন্য নির্দিষ্ট খাটে পরিপাটি বিছানার পরে নিজেকে কোনও রকমে টেনে নিয়ে ফেললাম। তখনও বহু নরনারী আরতি শেষের প্রণামে ভূমিতে প্রসারিত। উদ্দীপ্ত ঢাকী ঢুলির উৎসাহিত বাজনায় আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ছে।

মুদিত দুই চোখের উপর একটি কোমল করস্পর্শ অনুভব করলাম।

—ভট্‌চায্‌—বটু—ভট্‌চায্‌।

চোখ মেললাম। সৌদামিনী উৎকণ্ঠিত-স্বরে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকছে।

—খুব ক্লান্ত হয়েছ? খারাপ লাগছে? শরীর? সারাদিন নিরম্বু উপোস—তারপর এই—ওঠ, চল কিছু মুখে দেবে।

হাত ধরে বিছানা থেকে ওঠালো।

তার সেই কক্ষের মেঝেতে আমাকে আসনে বসিয়ে জলের হাতে সামনেটা বুলিয়ে নিয়ে শ্বেত পাথরের গ্লাস বাটি রেকাবী থালা ফলমূল, পানীয় খাদ্যর একটা ভীতি সাজিয়ে দিল।

—এত অল্পে পেট ভরবে কেন?

—বেশী হল? আমাকে যে তোর প্রসাদ খেতে হবে।

ওর মা আর অনেক পুরবাসিনী আমায় ঘিরে বলতে লাগলেন, খাসা পূজো করেছি আমি। ধন্যি পুজো সদুর।

বাইরে থিয়েটার সুরু হয়ে গেছে। সমস্ত আলো নেবানো। শুধু প্রতিমার সামনের ঘৃতের প্রদীপ টিম্ টিম করছে। স্টেজ গ্যাসের ফুটলাইটে জল্ জল্ করছে। কানাই ঔরংজেবের পার্টে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল,...তাকে সমাদর করে নিয়ে এস। পরক্ষণেই দানীবাবুর স্টাইলে একটা মোসান দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা তুমি থাক, আমি যাচ্ছি। একটা করতালির ঢেউ বয়ে গেল।

আমি আমার সেই বিছানায় গা ঢেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কী যেন, নিদ্রা কি ক্লান্তি, আমার চৈতন্যের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দিল।

মাঝে মাঝে একটা দুটো শব্দ কানে আসছে? একবার একটা ঐকতানের ক্ষীণ সুর। একবার একটা বুকফাটা চাপা গর্জন—দেবো লাফ্। দেবো লাফ্। আবার সব নিস্তব্ধ নিঝুম।

সমস্ত নিঝুম নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছে পৃথিবীর কোথাও শব্দ নাই। একটি গভীর নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার মাঝে সব ডুবে গেছে। কেবল আমার কানের মাঝে সহস্র ঝিঁ ঝিঁ পোকা একসঙ্গে ডেকে চলেছে। আমার মাথার মাঝে অসংখ্য হাতুড়ি একসঙ্গে পিঠছে, আমার সর্ব্বাংগ অবসন্নতায় অবশ, অসাড়। দুই চোখের পাতা যেন পাথর দিয়ে তৈরী, তাতে পাথরের ভার। একটা তীব্র ব্যথা আমার কোমরে, কখন আমার দুই বাহুতে, কখন আমার পিঠে সঞ্চারণ করে ফিরছে।

আমার মন্ত্রচৈতন্যে অনুভব করছি, আমার খুব কাছে খুব বড় একটা উপস্থিতি, একটি বিরাট শক্তির অপরিমেয় নিরাকার আবির্ভাব আর অবস্থান। আমাকে তা যেন তার মাঝে আচ্ছন্ন বিলীন করে নিচ্ছে। একটি সুবাস একটি কম্পন, একটি স্থির অনিমেষ দৃষ্টি। দেবীর চোখের মত অপূর্ব্ব দুটি কালো চোখের একটি অপলক দৃষ্টি যেন আমার মুদ্রিত চোখের পরে স্থির হয়ে আছে। আমার বুকের মাঝে যেন ধীরে ধীরে সমুদ্রের জোয়ার ফুলে উঠছে; আর আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে আনছে।

জোর করে প্রবল চেষ্টায় চোখ মেললাম। অন্ধকার। পুবের খোলা জানালা দিয়ে স্বচ্ছ আকাশের নীলাভ আলো, নীচের বড় ছোট গাছের ফাঁকে নদীর খানিকটে ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের মত চক্‌চক্ করছে। শেষরাত্রির হিমেল হাওয়া চোখে এসে লাগল।

একটি সুস্পষ্ট গভীর নিঃশব্দ ক্রন্দন, কম্পিত চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস। অতি স্পষ্ট। কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার শয্যার সঙ্গে আমার চারিদিকের সঙ্গে সুনিশ্চিত কেঁপে কেঁপে উঠছি। চোখ আরও বিস্ফারিত করে চাইলাম। সেই কালো স্থির দৃষ্টির সাথে আমার বিভ্রান্ত ভীত দৃষ্টি মিললো। সৌদামিনী শয্যার পরে আমার পাশে বসে। আমার মুখের প্রতি তার সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ, কোমরের কাছে তার দেহের পুষ্ট কঠিন কোমল খানিকটে স্পর্শ। উভয়কে ব্যাপ্ত করে রাত্রিশেষের উৎসবক্লান্ত গভীর সুষুপ্তি গভীর নীরবতা। বিশ্বপ্রকৃতি যেন চোখ বুজে রুদ্ধনিঃশ্বাসে দম্ বন্ধ করে রয়েছে। পাশের খোলা জানালা দিয়ে আকাশের একটুখানি বৃত্তাকার একস্থানের পুঞ্জীভূত তারার আলো এসে একটি সাড়ির লাল আর সোনালী ঝিকমিক করছে। একটি সিঁথির সিঁদুর-রেখা একটি সিঁদুরের ফোঁটা তার নীচে দুটি অশ্রুপ্লুত কাজল-চোখের একাগ্র বেদনার্ত্ত দৃষ্টি, একটি পাতলা অধর সম্মুখে কুন্দ-শুভ্র দাঁতে বিদ্ধ হয়ে থরথর করে কাঁপছে;—একটি বিপুল কম্পিত আবেগ সেই নিবদ্ধ-দৃষ্টি কালো চোখের থেকে, সেই কম্পিত অধরোষ্ঠ থেকে নিসৃত হয়ে ধীরে ধীরে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আমাকে থর্‌থর্ করে কাঁপাচ্ছে। আমার বুকের মাঝে ঢিপঢিপ করে বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ করে কী যেন কী বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। উঠে বসে তার হাত ধরে যেন জীবনের ওপার থেকে ডাকলাম, সন্তু।

সে যেন মন্ত্রচালিতের মত আমার বক্ষে তার কপাল রাখল। সেই স্পর্শে আমি যেন মুহূর্ত্তে পাথর হয়ে গেলাম। শীতল পাথর। সেই পাথরের মধ্যে একটি ভীষণ শব্দ উঠতে লাগল, ঢিপ্‌ঢিপ ঢিপ্‌ঢিপ্।

অদূরে সজ্জপূজিতা দেবী খাটের উপর দণ্ডায়মানা, জাগ্রতা।—একদিকে খাটে তার পূজারিণী তার পূজারীর বক্ষে মস্তক রেখে,—মূর্চ্ছাহতা না আত্মনিবেদিতা।

আমার চিবুকের নীচে, সেই কালো চুলের রাশি। সেই সৌরভ। আমার বুকের পরে উৎসর্গের মন্ত্রপূত অশ্রুধারা। আমার সর্ব্বাংগ ব্যেপে একটি প্রলয় কম্পন। আমি ধীরে ধীরে সেই লুণ্ঠিত মস্তকের উপর আমার মুখ রাখলাম, একহাতে তাকে বেষ্টন করে ধরলাম। পুবের জানালা দিয়ে বৃহৎ একটি তারা আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সৌদামিনী ভূমিকম্পের কম্পনে কাঁপতে লাগল; মনে হল তার দেহ অণুপরমাণুতে ছিন্ন হয়ে যাবে। আমি তেমনি করে বসে রইলাম, সে তেমনি করে আমার বুকের পরে অশ্রুধারার প্লাবন বইয়ে প্রলয় কম্পনে কম্পিত হতে লাগল। বিশ্বচরাচর উভয়ের জগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

ঘরে উষার প্রথম আলোক প্রবেশ করল। নিবিড় বেদনায় অবরুদ্ধ কণ্ঠের একটি ত্রস্ত চাপা কথা—কেমন আছ দেখতে এসেছিলাম। সেই অস্ফুট কথা ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে গেল। সৌদামিনী নিজেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে নিলো। ধীর পদক্ষেপে প্রতিমার সম্মুখে উপস্থিত হলো, জানু পেতে বসলো এবং আস্তে আস্তে প্রতিমার সম্মুখে একটি সাষ্টাংগ প্রণিপাতে নিজেকে প্রসারিত করে দিল। নিঃস্তব্ধ নিঃসাড়।

আমি শিয়রে বসে ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বোলাতে লাগলাম। প্রত্যুষের আলোয় প্রাংগণ হেসে উঠলো।

বাজাদাররা সম্মুখে এসে বাজনায় মেতে উঠল। লোকে লোকে ভরে গেল। দেবীর সম্মুখে সাষ্টাংগে প্রসারিতা সৌদামিনীর আপাদমস্তক থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সৌদামিনীকে দেবী দর্শন দিয়েছেন বলে একটা তুমুল কলরব উঠল। সকলে বলছে, ধন্য সৌদামিনীর পূজা।

দ্বিগুণ উৎসাহে বাজনা বাজতে লাগল।

লালন ফকির

বসন্তকুমার পাল

"আমি একদিনও না দেখ্‌লাম তারে! আমার বাড়ীর কাছে আর্শি নগর পড়সী বসত করে," যাঁহার মর্ম্মতল হইতে মনের মানুষের জন্য এইরূপ দরদের ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অমৃত নিস্যন্দিনী গৌরীতীরে বেণুপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন, বনবিটপী পরিবৃত পল্লীর ক্রোড়ে পালিত সেই নিরক্ষর সাধক ফকির লালনের ইংরাজী ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার অনতিদূরে ভাঁড়ারা গ্রামে বিখ্যাত কায়স্থ পরিবারে জন্ম এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রত্যূষে সেঁউড়িয়া আখড়ায় তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। তরুণ বয়সে তিনি বাউলদাস নামক কোনও প্রতিবাসীর সহিত পর্ব্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নানে যান, নৌকাযোগে ফিরিবার সময় পথে বসন্ত রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হইয়া যখন অচৈতন্য অবস্থায় পতিত হন, কর্ত্তব্য-পরায়ণ সঙ্গীগণ তখন তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া মুখে আগুন দিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেন এবং বাড়ী ফিরিয়া জোরগলায় ঘোষণ করেন যে লালন বড় ভাগ্যবান! তীর্থস্থানে গিয়া তাহার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, সুতরাং সে এখন বৈকুণ্ঠনিবাসী। এইরূপ পুণ্যার্জ্জনের কথায় জনসাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া, স্বকীয় দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লইয়া, যে যাহার মত পৈতৃক প্রাণসহকারে আপন আপন ঘরে উঠিলেন আর লালনের দুঃখিনী জননী ও সহধর্ম্মিণী দুঃখ, শোক ও নিরাশায় পাষাণে মাথা ভাঙ্গিতে লাগিলেন।

গঙ্গাবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় লালনের জড়দেহে জীবনপ্রবাহ, ফল্গু-স্রোতের ন্যায় তর তর করিয়া বহিতেছিল। যখন তিনি চেতনা লাভ করিলেন, দেখিলেন, তিনি বীচিমালা-বিধৌত নদীতটে পরিত্যক্ত, ক্ষোভ ও নিরাশায় বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, মৃদুস্বরে রোদন করিতেছেন, এমন সময় বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে কোন দয়াবতী মোস্লেম রমণী নদী পুলিনে আসিলে লালনের রোদন শুনিতে পাইলেন। স্নেহপ্রবণ জননী-হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল, তিনি এই জড়দেহকে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে নিজগৃহে লইয়া যান এবং সন্তানজ্ঞানে যত্ন ও শুশ্রূষা করেন; লালন যখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হন, তখন সিরাজ সাঁই নামক কোনও দরবেশ আসিয়া তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে সমাসীন হন। তিনিই লালনকে প্রথমে ধর্ম্মপথের আলোক প্রদান করেন। ইহার পর সুস্থ ও সবল হইয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, দেখিলেন তাঁহার শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া এবং মৃতায় ভরিভোজনম্ যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে; হিন্দুসমাজ আর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। ভাগ্যাহত লালন ফকির হইলেন, সেঁউড়িয়া আখড়া স্থাপন করিলেন এবং ১১৬ বৎসর বয়সে সেখানেই সমাধিস্থ হইয়া আছেন।*

* লালনের ভাব-মন্দাকিনীর পুণ্য ধারা শত মুখে প্রবাহিত, তাহার কিয়দংশ "লালন ফকির" নাম দিয়া প্রকাশ করিতেছি। এই প্রবন্ধে শুধু এই মাত্র দেখাইব যে তিনি বিশাল ভারতের অগণিত সাধকেরই একজন এবং ভারতীয় সাধনা ও সিদ্ধির কথাই তিনি সরল গ্রাম্য ভাষায় অতি চমৎকার রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বগৃহে প্রত্যাখ্যাত হইয়া লালন এখন সেঁউড়িয়া আখড়া স্থাপন করিলেন। গৃহস্থের মত যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন তাহাতে তিনি কোন্ জাতীয়? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছেন,

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন কয় জেতের কিরূপ দেখলেম্‌না এনজরে।
যদি শুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বাম্‌নী চিনি কিসে রে!
কেউ মালা কেউ তস্‌বির গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে!
জগৎ বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করেন যথা তথা,
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাত বাজারে!

লালন এখন পিঞ্জর বিনিষ্ক্রান্ত বিহঙ্গের ন্যায় ধরণীর স্নিগ্ধ বক্ষের মুক্ত সমীরণে অন্তর খুলিয়া বিহরণ করিতে আকুল। তিনি এখন দরবেশ, জনসাধরণের নিকট সাঁইজী বলিয়া পরিচিত, কোনও অচিন দেশের অধর মানুষ ধরিবার প্রবল বাসনায় দিবারাত্রি ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন; তাঁহার অন্তরের ভাবরাশি যখন দুকূল প্লাবিনী তটিনীর ন্যায় আকুল কল্লোলে স্ফীত হইয়া বহির্জ্জগতে আত্মা-প্রকাশ করিত, শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিতেন "ওরে আমার পুণামাছের ঝাঁক এসেছে"। শিষ্যেরা যে যেখানে থাকিত শুনিবামাত্র ছুটিয়া আসিত, সাঁইজী মুখে মুখেই গান ধরিতেন, শিষ্যেরা যন্ত্রের তান লয়ে গাহিয়া চলিত। ইহাতে সময় অসময় ছিলনা, সব সময়েই অতর্কিতে এইরূপ পুণামাছের ঝাঁক আসিত। ইহাও একরূপ ভাগ্যেরই কথা। প্রকৃতপক্ষে এক জীবনেই লালনের জন্মান্তর। তাই তিনি বলেন—

সকলই কপালে করে,
কপালের নাম গোপালচন্দ্র
কপালের নাম শুয়ে গোবরে,
যদি থাকে এই কপালে
রত্ন এনে দেয় গোপালে
কপালে বেমতী হ'লে
দুধ্‌লো বনে বাঘে ধরে।

কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী
কপালের ফল হয় সুবারি
মনের ঘোরে বুঝতে নারি,
ঘুরে মরি অনাকারে।
যার যেমন মনের কামনা
সেউ তেমন পেয়েছে সে-না,
লালন বলে ভাব্‌লে হয় না
বিধির কলম আর কি ফেরে!

আধ্যাত্মিক জগতে ফকির কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া তিনি তাঁহার অধর মানুষকে কি অর্ঘ্য দিয়াছেন তাহারই দু-একটা কথা মাত্র এখানে বলিব। ভগবান শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে জানিয়া লও "কস্ত্বং কোহয়ংকুতয়ায়াত" অর্থাৎ তুমি কে, কোথা হইতে এই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছ। সাঁইজীও বলেন—

আপন খবর আপনারে হয় না
আপনারে, চিন্‌লে পরে,
যায় অচেনারে চেনা।

আপন পরিচয় লাভ না হইলে পরকে কেমন করিয়া চিনা যায়? লালন বলে "পর ব'ল্‌তে পরমেশ্বর" তাই এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহাকে 'আমি' বলিয়া প্রকাশ করি প্রথমে তাহারই স্বরূপ নিরূপণ করিতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে
আমি জনম ভরে একদিন দেখলাম না রে!
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে, আমি দেখ্‌তে পাইনে দুনয়নে,
সে যে, হাতের কাছে যার, ভবের হাট বাজার
আমি হাত বাড়ায়ে ধ'রতে পেলেম না তারে!

তাঁহার মনখানি কেমন, তাঁহার অবয়ব কি এবং তাঁহার অভ্যন্তরীণ রচনা চাতুর্য্য বা কতখানি ইহার বর্ণনা দিতে গিয়া সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

ক'রে অতি আজব ভাক্কা,
গ'ঠেছে সাঁই মানুষ মাক্কা
কুদরতি নুর দিয়ে।
ও তার চা'র ধারে চার
নুরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে।
(কুদরতি নুর = ঐশ্বরিক জ্যোতি)

অতি অপূর্ব্ব গঠন-নৈপুণ্যে ঐশ্বরিক তেজপুঞ্জ সুশোভিত করিয়া পরম করুণাময় পরমেশ্বর মানবের তনুভাণ্ড বারাণসী আপন মঙ্গল-হস্তে রচনা করিয়াছেন, ইহার চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময় প্রহরী, আর মধ্যস্থলে তিনি পরং জ্যোতিরূপে স্বয়ং উপবিষ্ট, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সুললিত ভাষায় এই ভাব-ধারা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার বিকাশ
তাই এত মধুর।

পঞ্চভূতে রচিত এই দেহ-মন্দিরে জ্যোতির্ম্ময় সত্তা উপলব্ধি করিতে ফকির এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ উভয়ে একই কথা বিভিন্ন ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। উভয়েই বলিতেছেন দ্বৈত সাগরে ডুব দিয়া অদ্বৈতের কূলে উঠিতে হয়। বৈষ্ণবের কথায়—রাধাকুণ্ডে দিয়ে ডুব শ্যামকুণ্ডে ওঠ রে! বাইবেলে উক্ত হইয়াছে God made Man in His image did He make Man, ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া সাঁইজী বলেন—

স্বয়ং রূপ দর্পণে ধ'রে, মানব রূপ সৃষ্টি করে হে!
দিব্য জ্ঞানী যারা, ভাবে বোঝে, তারা
মানুষ ধ'রে কার্য্য সিদ্ধি করে লয়।

এখানেও আমাদের মনে আসে শ্রীমদ্ভগবদগীতার কথা—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। অর্থাৎ এসংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ। এই সকল তত্ত্বকথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, পতিত মানবের দুঃখে করুণা-বিগলিত হইয়া যাঁহারা নির্ব্বাণ-দীপকরে ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই মূলতঃ একই বিশ্বজনীন সত্য-সত্তার পরিবেশন করিয়া বিশুষ্ক সমাজ স্নিগ্ধ ও আমোদিত করিয়াছেন। একই সত্য, একই অণুপ্রেরণা এবং একই আশীর্ব্বাদ বিভিন্ন ভাষায় বিবিধ ছন্দে প্রকাশিত হইয়া জীবন-তরঙ্গের ন্যায় বিশ্বময় ঝঙ্কৃত হইতেছে। পরমহংসদেবের কথায় বলিতে হয় "সব শেয়ালের একই রা—"। সাধনার শাশ্বত নিকেতনে প্রবেশ করিতে হইলে মনের সাহচর্য্যই অপরিহার্য্য। মন যদি ভগবদ্ভাবে অণুপ্রাণিত না হয় তাহা হইলে কোন মতেই আর আনন্দের চন্দ্রালোকে প্রবেশ করা যায় না। তাই সাঁইজী কাতর কণ্ঠে গুরুকে ডাকিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া বলিয়াছেন—

গুরু দৈন্য গুরু দোহাই তোমার
মনকে আমার নাওগো সুপথে,
নাহ'লে তোমার কৃপা
সাধন সাধব কি মতে।
যন্ত্রি যন্ত্রর যেমন,
যে বোল বাজায় বাজে তেমন,

তেম্‌নি মত আমারি মন,
গুরু বোল্‌ তোমার হাতে।

সাঁইজী আমিত্ব ভুলিয়া তন্ময়-চিত্তে ভাবিতেছেন ভগবানই নিখিলবিশ্ব পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন ঠিক যেন যন্ত্রীর ইচ্ছায় যন্ত্রের সুরোচ্ছ্বাস উঠিতেছে বা নামিতেছে ; তাই তিনি বলিতেছেন "গুরু বোল তোমার হাতে"। তারপর বিমর্ষচিত্তে গাহিয়াছেন—

মন হোয়েছে পবনগতি, ও মন উড়ে বেড়ায় দিবস রাতি,
ফকির লালন বলে গুরুর প্রীতি, ও মন! বয়না সুহালে।
চাতক স্বভাব না হলে॥

এখানেও মনে আসে অর্জ্জুনের কথা—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম॥

সাঁইজী আখড়া স্থাপন করিয়া শিষ্যাদি সমভিব্যাহারে গৃহস্থের ন্যায় সমারোহে বাস করিতেন কিন্তু বিষয়ের প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিলনা, মনকে কত বুঝাইতেন, মন আর কিছুতেই ধর্ম্মের কাহিনী শুনিতে চাহিত না তাই বড়দুঃখে বলিয়াছেন—

বিষয় বিষে চঞ্চল মন দিবা রজনী, মন ত বুঝালে বোঝেনা ধর্ম্মকাহিনী,
বিষয় ছাড়িয়ে কবে, মন আমার শান্ত হবে হে!
আমি কবে সে চরণ, করিব শরণ, যাতে শীতল হবে তাপিত পরাণী।

ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বিষয়রূপ গরলের পার্শ্বেই যে অমৃতের পুণ্যপ্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে ইহা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন—

অয়িঢাকা যৈছে ভস্মের ভিতরে, সুধা আছে তৈছে গরলের ভিতরে,
যে জন সুধার লোভে গিয়ে, মরে গরল খেয়ে, মন্থনের সুতার জানেনা তারা।

গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানদণ্ড দ্বারা একত্র মিশ্রিত সুধাগরল, জল মিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় মন্থন করিয়া সুধাধারা সেবন করিতে হইবে। ইহার জন্য সাঁইজী একটী চমৎকার উপমা দিয়াছেন—

যে স্তনের দুগ্ধ খায় রে শিশুছেলে, জোঁকের মুখে তথায় রক্ত এসে মেলে,
লালন ফকির বলে, বিচার করিলে, সুরসে কুরস মেলে এইধারা।

দুগ্ধপিয়াসী শিশু যে স্তনে মুখ দিয়া পিযুষ-ধারা সেবন করে, শোণিতপিপাসু জলৌকা তাহাতেই মুখ দিয়া রক্তের ধারা শোষণ করে। আমাদের প্রাণ হইতে সন্তান-সুলভ সরলতা অপসৃত হওয়ায় যখন লালসার বশে জলৌকার মত জননীর বক্ষে মুখ দেই, অমৃত নিস্যন্দিনীর অমিয়ভাণ্ড হইতে তখন আমাদের আবিল আননে শোণিতের ক্ষর ধারাই ছুটিয়া আসে। সাঁইজী তাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

দুগ্ধেতে জলেতে মিশাল সর্ব্বদা, মন্থন দণ্ডে করে আলাদা আলাদা,
তাবের ভাবি হবে, সুধা নিধি পাবে, মুখের কথায় নয় রে সে ভাব করা।

বিষয়ের রূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি ভোগবাসনা-বিতৃষ্ণ গৃহস্থের ন্যায় হতাশ স্বরে গাহিয়াছেন—

দেখ্‌লাম এসংসার ভোজের বাজি প্রায়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তেম্‌নি কেবা কোথায় যায়,
মিছে এসব বাড়ী, মিছে টাকা কড়ি, মিছে দৌড়াদড়ি, করি কার মায়ায়।

সাঁইজীর সাধনা-সৌধের প্রধান সোপনই ভক্তি, এই মন-মাতান ভাবই তিনি সাধকের হৃদয়ে সঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইতেন ; ইহাই ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া অবশেষে মধুর ভাব বসন্তানিলের প্রবাহ তুলিয়া সাধকের হৃদয় মর্ত্তের নন্দনকাননে পরিণত করিয়া তুলে। বিশ্ব ভুলিয়া প্রাণের একমাত্র আরাধ্য দেবতাকে আত্মহারা হইয়া ভালবাসা—যাহা একদিন যমুনাপুলিনবিহারিনী বেণুধ্বনি-উন্মনা গোপাঙ্গনাগণকে মাতোয়ারা করিয়া ফেলিয়াছিল।—ইহার উল্লেখ করিতে তিনি গাহিয়াছেন—

সে ভাব সবাই কি জানে,
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা
গোপীর সনে,
গোপী বিনা জানে কেবা,
শুদ্ধরস অমৃত সেবা,
গোপীর পাপ পুণ্য জ্ঞান থাকেনা
কৃষ্ণ দরশনে।

আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ সাঁইজীর সঙ্গীতরাজীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব রহস্যময় ভাব নিহিত আছে, ভাষার বহিরাবরণ উন্মোচন করিলে উহা সাধককে এক রহস্যময় রাজ্যে লইয়া যায়, যেখানে প্রবেশ করিলে সাধক এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাবে তন্ময় হইয়া থাকেন। এই শক্তিই "মন্ত্রময়ী কুলকুণ্ডলিনী সমস্ত জীবের মূলাধারে বিদ্যুৎ প্রভায় দেদীপ্যমানা" তিনিই আবার যোগীগণের হৃদয়-কমলে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন। এই সাধনার কথা ইঙ্গিত করিয়া সাঁইজী বলেন—

চেয়ে ছাখ্‌না রে মন! দিব্য নজরে
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক
মণি কোঠার ঘরে।
হ'লে সে চাঁদের সাধন
অধর চাঁদ হয় দরশন
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ফিকিরে।

আমাদের অন্তরে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না পথে অবস্থিতা চারি চাঁদ অর্থাৎ চতুর্দ্দল পদ্মে বিরাজিতা নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে অপার সাধনাবলে উদ্বুদ্ধ করিলে পর ইহা সর্পিলগতিতে চক্রে চক্রে

ছুটিয়া ছুটিয়া ক্রমে দশমদল, দ্বাদশদল ও ষোড়শদল অতিক্রম করিয়া অবশেষে ক্রমধ্যস্থ দ্বিদল পদ্মে অবতীর্ণা হন। ইহার অভ্যন্তরীণ ভাব-ধারার আরও কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

মানুষ মাত্রা কুদরতি কাজ, উঠ্‌ছেরে আজগবি আওয়াজ সাততালা ভেদিয়ে,
আছে সিং দরওজায়, দ্বারী একজন নিদ্রাত্যাগী হোয়ে।

এস্থলে আজগবি আওয়াজ অর্থাৎ ধ্বনিময়ী শক্তি যোগীন্দ্র পুরুষগণের হৃদয়চারিণী পূর্ব্বোক্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরই নামান্তর। ইনিই "জীবের মূলাধার বিবর ভৃষ্টীর সঙ্গীতবৎ অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি করিয়া থাকেন।" সাততালা ভেদিয়ে অর্থাৎ সপ্তচক্র ভেদ করিয়া শব্দব্রহ্মের অর্থাৎ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া আহত ধ্বনির যে অভিব্যক্তি তাহারই কথা বলিতেছেন। সাঁইজী আরও বলেন "অচিনদলে বসতি তার, দ্বিদল পদ্মে বারাস তার।" দ্বিদল হইতে অচিনদল যাহা ষট্‌চক্র ভেদী সাধকের সহস্রার অর্থাৎ অকথাদি ত্রিকোণ ভূমি। এখানে গুরু হংসারূঢ় হইয়া অধোমুখে বিরাজমান; দিব্য নজরে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া সাধক পূর্ণসিদ্ধিতে উৎফুল্ল ও পরিতৃপ্ত হন। দ্বিদলের কথায় সাঁইজী পুনরায় বলেন—

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে,
রূপ দেখ্‌লে নয়ন যায় ভুলে,
ফণীমণি সৌদামিনী
জিনি এরূপ উজলে!

দ্বিদলে উপস্থিত হইলে সাধকের মনোমন্দির এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হয় যাহার নিকট ফণীমান সৌদামিনীও তুচ্ছ বলিয়া প্রতীতি হয়। এই জ্যোতির কথা আলোচনা করিতে সাঁইজী অন্যত্র বলিয়াছেন—

যেখারে সে চন্দ্রভুবন
দিবারাত্রি নাই আলাপন
কোটীচন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলী চঞ্চলা সদাই।
বিন্দু নালে সিন্ধু বারি,
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি
অধর চাঁদের স্বর্ণপুরী
সেইত তিন প্রমাণ জাগায়।

দ্বিদল হইতে অভ্রষ্ঠক আবরণ ভেদ করিয়া যে দর্শন তাহার বর্ণনাও সুচতুর ভাষায় করিয়াছেন,

ফুল ফোটে তার গঙ্গাজলে,
ফল ধরে তার অচিন দলে,
যুক্ত হয় সে ফুলে ফলে
তাতে কথা কয়।

এখানে বর্ণিত গঙ্গাজল অর্থাৎ সুষুম্নামার্গে উপনীত হইলে সাধক স্বীয় সিদ্ধির অরুণালোকে উদ্ভাসিত হন, তথা হইতে অচিনদল অর্থাৎ অবিদ্ব "সম্বতে সনিত্য গোলক, বিরাজ করে যেথায় পূর্ণ-ব্রহ্মলোক" সেই সহস্রারে বিরাজিত গুরুকে দর্শন করিলে তাঁহার সাধনার কল্পতরু ফুলে ফলে পরিশোভিত হয় অর্থাৎ তিনি পূর্ণ-সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভাগ্যবান সাধক, তখন "কৈবল্যময় ভাব-সাগরে মনঃপ্রাণ নিমজ্জিত করিয়া অগাধ শান্তির অন্তস্তলে চৈতন্য শয্যায় শয়ন করিয়া ব্রহ্মানন্দ নিদ্রার উপভোগ করেন"। সাধনার এই পুণ্য নিকেতনে বসিয়া লালন যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন তাহা,

অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়, দেখতে হয় বাসনা হৃদয়,
লালন বলে থেকো সদায়, ত্রিবেণীতে থেকো ব'সে।

সাধকের চলিবার শক্তি আছে এই ত্রিবেণী পর্য্যন্ত, কারণ চিন্তার প্রবাহ শুদ্ধ হইতেছে ত্রিবেণী সঙ্গমে; ইহার "তোড় তুফান" উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য মানবের নাই, তাই সাধক এইস্থানে বসিয়া সর্ব্বদ্বার সংরুদ্ধ তমসাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রকলায় দৃষ্টি নিরুদ্ধ রাখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়া থাকেন—সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে তরতর স্বরে ত্রিবেণীর সম্মিলিত বারিপ্রবাহ, আর নয়নে ঝলমিত হইতেছে চন্দ্রকলার (ওঁ) অপরূপ জ্যোতি; তিনি জপেন তাঁহার মূলমন্ত্র আর ভোগ করেন গোলকের আলোক ধারা; সাধন পথের এইখানেই অন্ত।

সাঁইজী সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন যখন তাহা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, সেইদিন তাঁহার এক অপূর্ব্ব ভাব সমাধি, যে গুরুর করুণাধারা লাভের জন্য তিনি অনুক্ষণ লালায়িত ছিলেন তাঁহারই চরণ তরণী আশ্রয় করিয়া ভবপারের যাত্রী হইলেন, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিলেন, তাঁহার নয়ন-পথের সর্ব্বত্র মনের মানুষ নিরীক্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গাহিলেন—

জলস্থলে সব জায়গায়, তোমার সব কীর্ত্তিময় ত্রিবিধ সংসারে,
না বুঝে অবোধ লালন, পড়ল বিষম ঘোরতরে।

উপন্যাস

পুরশ্চরণ

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত শেষ হয়ে আসছে। নীল অসীমের বুকে সাদা পাঁজা পাঁজা তুলোর মত মেঘের আড়ালে জলজলে শুকতারাটা সুপ্রভাতের প্রতীক্ষায় আরো উজ্জ্বল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আগত; নিষ্ঠাবানের নিয়মমত ঘুম ভাঙ্গে, প্রাতঃকৃত সারা হলে সরষের তেলের শিশি আর গামছাটা কাঁধে ফেলে তাঁরা বেরিয়ে পড়বেন ঘর ছেড়ে। রাস্তায় ভিস্তিওয়ালারা বেরিয়ে গেছে জোড়ায় জোড়ায় কাঁধে ক্যানভাসের পাইপ আর হাতে চাপা কল-খোলার যন্ত্র নিয়ে। একটু পরেই ভিজে উঠবে রাস্তাগুলো রাতের ময়লা সাফ্ হয়ে যাবে সুপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে। তার পরেই এক একটি করে লোক দেখা দেবে ধোয়া মোছা রাস্তায়।

ঐ তো এ পাড়ার শ্যামভাই-এর উদাত্ত সুরেলা স্বর শোনা যাচ্ছে—প্রভাতী সুরে, শান্ত, গম্ভীর অথচ সজীব আনন্দে ভরপুর ঐ সুর এ পাড়ার অনেকেরই ঘুম ভাঙ্গায়। আপন মনে গেয়ে যান শ্যাম ভাই। এ পাড়ার সবার আপনজন শ্যামভাই। হাসি হাসি মুখ, বৈষ্ণবী বিনয় আর বয়সে বনেদী। শ্রদ্ধা পাবার সব গুণের মধ্যে চেহারাটিও বাদ যায় না। গৌরাঙ্গ নামের উপযুক্ত নাম দানের মতই চেহারা। দীর্ঘ দেহ, গৌর রঙ আজানু বাহু, উন্নত নাসিকা আর ঈষৎ বসা চোখের সঙ্গে মধুর স্বর সকলকেই কাছে টানে—এ পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই শ্যামভাইকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।

—রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ রাধে।—খঞ্জনীর তালে তালে সুমধুর কণ্ঠ মাধুর্য্যে ভরপুর। নাম-গানের রেশ পাড়ার আনাচে কানাচে ঘুমন্ত মানুষের কানে কানে বলে চলে—ওঠো জাগো সুপ্রভাত।—শ্যামভাই আপন মনে গেয়ে যান নাম-গান। দু' একজন বৃদ্ধা যেন এই কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায় থাকে, তাই সুরের রেশ কানে যেতেই তাঁদের শয্যা ত্যাগে এতটুকু দেরী হয় না। তাঁরা কাশতে কাশতে বাড়ী ছেড়ে গোবিন্দর নাম বা ব্রহ্মময়ীর নাম স্মরণ করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন।

রাস্তার মাঝামাঝি পঞ্চুর চায়ের দোকানের উনুনের গন্‌গনে আঁচে বড় ডেক ভর্তি জল গরম হল, শাঁ শাঁ শব্দ তুলে জ্বালাল, সে তৈরী।

বিরাজ বুড়ো কাশতে কাশতে ডাকেন—ওরে পঞ্চু, ও বাবা অধীর, বেলা যে অনেক হোল, চা কি দিবি নে?

আফিমের নেশা বিরাজ বুড়োর। ভোর রাতে চা না পেলে সব কিছুই কেমন ঘোলা হয়ে যায়। তাই বিরাজ বুড়ো অধৈর্য হয়ে পড়েন—দোকান খোলার ব্যাপারে পঞ্চুর ঢিলেমী দেখালে। তারপর বিরাজ বুড়োর হাঁক ডাকে হরিদাস পঞ্চুর দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। বিরাজ বুড়ো আর

হরিদাসই হলো এ পাড়ার পঞ্চুর চায়ের দোকানের প্রথম খদ্দের। প্রতিদিনই এরা প্রথম সাহিদ করে সধুম সোনালী চায়ের সঙ্গে পাঁচ-মজলিশীর।

শ্যামভাই নামগান করেন প্রভাতী সুরে। ঐ রাধে গোবিন্দ নাম গানের সুর মুখুজ্যে বাড়ীর একতলার বৃদ্ধাকে জাগিয়ে তোলে। বৃদ্ধা হাই তুলে কপালে জোড়া হাত ছুঁয়ে রাধেকৃষ্ণের কাছে জানান তিনি সজাগ,—তুমি এবার দয়া কর। পাশে শোয়া সাত বছরের নাতিটাও উঠবে খানিক পরে। আর উঠেই খেতে চাইবে ছেলেটা। বৃদ্ধা ওর খাবার ব্যবস্থা করবে—কএকটি পদ্মকাটা বিস্কুট আর চারটি রসগুড়ি। আর বৃদ্ধা তাঁর ভাঙ্গা কোমর নিয়ে গঙ্গাস্নানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বেন—রাতদিনের কি কালিদাসীকে ডেকে নিয়ে।

লালার মিষ্টির দোকানের ঝাঁপ খুলে গেছে অনেক আগে। আলো জ্বালিয়ে জিলিপির খামি নিয়ে কসরৎ চলে লালার। বিরাট উনুনের মুখে লোহার গোল ঢাকনাটার ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে আগুনের রামধনু-রঙা শিখাটা বেশ তীব্র হয়েই উঠেছে। ঢাকনাটা খুললেই কড়াটা ঘিরে লালচে আগুন মনের খুসীতে ভরে উঠবে আর কড়ার ঘি গন্ধ ছড়িয়ে খুশির সঙ্গেই আর একজনের সাথে মিতালী করবে। তারপর লালার কারিকুরিতে ঘি-ময়দা-চিনি-সুজি-আটা-আলু-বিউলির ডাল অগ্নি সহযোগে বড় বড় কানা উঁচু থালাগুলোতে জিলিপী-সিঙ্গাড়া-নিমকি-কচুরি সব শেষে কড়া ভাজা হালুয়া নিজস্ব গন্ধ আর স্বাদ নিয়ে অপেক্ষা করবে এ পাড়ার খোকা-খুকি, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ীদের জন্য। লালার বয়স বাড়ে কিন্তু হাত আজও কারিকুরিতে পটু। মুখে বিরক্তির লেশ নেই, হাসি লেগেই আছে সব সময়।

লালার দোকান থেকে একটু এগিয়ে মোড়ের কাছ-বরাবর পান বিড়ির দোকান। প্রায় সারা দিনরাতই দোকানটা খোলা থাকে ভোলার। অনেক কাল আছে ও এ পাড়ায়। খুব ছোট বয়সে কোথা থেকে যে ও এখানে এসেছিল কেউ জানে না, বুড়ি মোক্ষদাও নয়। ঝি-গিরি করতো মোক্ষদা কিন্তু প্রাণটা ছিল খুবই নরম; পথ থেকে কুড়িয়ে ভোলাকে মানুষ করেছে, তারপর দোকানে করে দিয়েছে বাবুদের দোরে ভিক্ষে মেগে। পক্ষাঘাতে বাক্‌রুদ্ধ তবু শেষের দিন বুড়ির চোখ দেখে ভোলাও বুঝতে পেরেছিল তার জন্য ভাবনা নিয়েই বুড়ীর ঝাপসা চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

—রাত আর দিনের মত মানুষ আসে, যায়—শ্যামভাই বলে—তা বলে ভাবনা নিয়ে পড়ে থাকবি কেন? হাসবি, কাঁদবি, আনন্দ করবি, ভাবিস নে ভাই। এ পাড়ার ছেলের দলে, বুড়োর দলে একথা শান্তি আনে।

কিন্তু আসে না এ পাড়ারই পূর্ব্ব দিকের মোড়ের মাথায়। রিক্সার আড্ডা, হোটেল, চার পাঁচটা পানের দোকান আর হরেক রকম লোকের মেলা—রাতদিন ভীড় লেগেই আছে। শেষ রাতেও ব্যস্ততা যায় না। ওদিকে রাত দুটো আর এদিকে ভোর থেকেই গাড়ী ঘোড়ার চলাচল লেগেই থাকে। যায়গাটা চীৎপুরের অতি বিখ্যাত আবার অতি-কুখ্যাত অঞ্চলের একটি—সোনাগাছি, গরাণহাটা রূপোগাছি। ওপারে আর এপারে আহিরীটোলা, গোঁসাইগলি, বসাকগলি। নিমতলা, ওপারে

কামিনী-কাঞ্চন আর তারি আনুষঙ্গিক উপকরণ আর এগারে চিরশান্তির প্রতীক শ্মশানের পথ আর সব মলিনতা ধুতে গেলে যেতে হয় এই পথে।

—সব পথই তো খোলা, বেছে নাও। ভালোমন্দ সবই পাবে।—শ্যামভাই বলে মৃদু হাসির সঙ্গে।

আকাশে ফিকে ভোরের আলো। আলতো আবছা আবছা আহিরীটোলা-ভালগটির ইঁদুরগুলো এই আলো দেখে সংযত হয়। অন্ধকারের দৌরাত্ম্য অন্ধকারেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাগবাজার থেকে প্রথম ট্রামগাড়ি ছেড়ে গেছে ঘর্ঘর আওয়াজ শোনাতে শোনাতে হর্ম্যতলার দিকে। পুরোনো ট্রামই বেশী, বাস এখনও যায় নি। ট্যাক্সি তো সারা রাতই চলেছে। এ পাড়ায় বিভিন্ন পাড়ার লোকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ক্লান্তি নেই, অবিশ্রাম এদের গতি আর অফুরন্ত ওদের ধৈর্য্য।

ময়লা ফেলার ঘোড়ার গাড়িগুলো ডালিমতলা থেকে এসব অঞ্চলের দিকে বেরিয়ে পড়েছে—একটু বাদে সব ময়লা এরা তুলে নিয়ে চলে যাবে নির্ব্বিকার চিত্তে। মুখে থাকবে ওদের দেহাতী সুরের সঙ্গে রাম-নাম। উঁচু যায়গা বলে ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে যাবে এপাড়া থেকে আর এক পাড়ায়; অনেকে নামবে ময়লা তুলবে; তারপর আবার চলবে আর সুরে বলবে—ভজলে সিয়ারাম, সিয়ারাম।—

—মধুর, মধুর, সবই যেন গোবিন্দের মধুর লীলা।—শ্যামভাই-এর গঙ্গাস্নান সারা হয়ে গেছে। ফিরছেন পাড়ায়। ঠাকুর ঘরের দোরে বসে রসকলিও সাঙ্গ করলেন। তারপর গোবিন্দের পূজার আয়োজন তাঁর মনে রইল পড়ে। এসময় গোবিন্দ আর শ্যামভাই—আর কিছুই বোধ হয় নেই।

ছেলেমেয়েদের গুন গুন স্বর ভাসে এপাড়ার বাতাসে। মুখুজ্যে বাড়ীর ছোট ছেলেটা ভারি দুষ্ট, পড়াতে মন নেই তবু বিরাজমোহনের কড়া হাতের চড় ওর ঠাকুমাও রুখতে পারে না। সেই জন্যই বোধহয় ছেলেটা উচ্চৈঃস্বরে পড়ে বিরাজমোহনের বাজার যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত। পাশের বাড়ীটা মিত্তিরদের—ও বাড়ীর অনেকগুলো ছেলেমেয়ের গলা পাওয়া যায়। 'অজগর আসছে তেড়ে' 'ভগবান সর্ব্বশক্তিমান' 'B-L-A-Y, C-L-A-Y' ইত্যাদির সাথে মারামারি চীৎকারে ছেলেমেয়েগুলো মাতিয়ে রাখে মিত্তিরদের বাইরের ঘরটা।

তারপর বেলা বাড়লে সোনা উড়ের তেলেভাজার দোকানে ভিড় জমে—বাচ্চা থেকে বুড়োদের। ফুলুরি, আলুর চপ, বেগুনির সঙ্গে এক পয়সা দু'পয়সা মুড়ির গ্রাহকেরা একটা কিছু ফাউ নেবেই।

—বাজার যাবে না?—স্বামী-স্ত্রীর সংসারে স্ত্রী স্নান সেরে বলে ওঠে।

—এই যে যাই। বেলা কত?—খবর কাগজে চোখ রেখেই স্বামী উত্তর দেয়।

—সোয়া সাত। দেরী কোর না লক্ষ্মীটি···খোকা এখুনি জালাবে। কই ওঠো।—কাগজটা কেড়ে নেয় স্ত্রী।

দোহারা চেহারা স্ত্রীটির। স্বাস্থ্যে জৌলুস, চোখে মুখে তেমনি সুস্থ পরিতৃপ্তির চিহ্ন। একটি

সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে মনের মত করে সংসার সাজিয়েছে সে। শিশুকেও খুব—নিরুপমা; আশে-পাশের বৌ-ঝি, মা-খুড়িদের সাথে খুবই ভদ্যতা আছে ওর।

স্বামী গোপীনাথকে খবরের লোভ সামলে উঠতে হয়। জামা গায়ে দিয়ে থলিটা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বাজারের উদ্দেশে।

কিন্তু একটু এগিয়ে সামনে পঞ্চুর দোকানে এক প্রস্ত দাঁড়াতে হয় তাকে—একটু গল্প আর এক কাপ চায়ের লোভ কিছুতেই সে সামলাতে পারে না।

—আজকের কাগজ দেখেছিস্ গুণী? মুসোলিনী অ্যাবিসিনিয়াকে কি রকম গাদান দিচ্ছে··· কোথায় যাচ্ছিস চাঁদ—নে···নে···বস্। চা খাবি?

দেরী হবে জেনেও বসতে হয় গোপীনাথকে। বলাইচাঁদ ছোটবেলার বন্ধু, মাথাটা যা একটু মোটা তা না হলে লোক ভাল। লোকের বিপদে প্রাণ দিয়ে খাটে। পাড়া-বেপাড়া নেই বলাইচাঁদের কাছে; চেনা থাকলে আর খবর পেলে বলাইচাঁদ স্বশরীরে সেখানে হাজির হবে। পঞ্চুর দোকানে বলাইচাঁদকে সকাল সাতটা থেকে পাওয়া যাবে। খবরের কাগজের সমস্ত খবর খুঁটিয়ে পড়বে আর চা তো আছেই। জীবিকার জন্য এখনও পর্য্যন্ত কিছু করতে হয় নি। বাড়ীভাড়া থেকেই সংসার চলে। সংসার বলতে বলাইচাঁদ আর তার পিসি। মা-বাবা দুজনেই গত হয়েছেন। বিয়েও করে নি বলাইচাঁদ। অনেক অনুরোধ আর মেয়ে দেখে পিসি এলে গেছে। বন্ধুরা বললে বলাইচাঁদ ভারিক্কি হাসি হেসে বলে, বিয়ে! আমাদের আবার বিয়ে! মড়া পুড়িয়ে এমন হয়ে গেছি যে কাছে কেউ ঘুমুলে মনে হয় বুঝি মরে গেছে, ঘাটে আনার কথা মনে পড়ে ভাই।

বন্ধু-বান্ধবেরা হাসে, বলে, এ তোর বানানো গল্প।

—গল্প বলবি বল কিন্তু এটাই সত্য।

বন্ধু-বান্ধব একথা বিশ্বাস না করলেও বলাইচাঁদকে তারা বিয়ে করাতে পারে নি বলে বলে, ও ব্যাটা মড়াকে বিয়ে করেছে, ওর কথা ছেড়ে দে।

এসব কথায় কান দেয় না বলাইচাঁদ, মনেও করে না কিছু—হাসির সঙ্গে উড়িয়ে দেয়। হাসিটা অদ্ভুত—পাড়া-কাঁপানো হাসি, সবাই চেনে এ হাসিকে আর জানেও এ হাসি কে হাসে।

গোপীনাথকেই বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বলাইচাঁদ বুদ্ধিমান সমঝদারের সম্মান দেয়। খবর-কাগজের কোন খবর মনে লাগলেই গোপীনাথকে না বললে বলাইচাঁদের তৃপ্তি হয় না। হিটলার মুসোলিনী-গান্ধী-সুভাষ-জহরের খবর টপ্ হেডিং-এ থাকলেই হোল; বাজার যাওয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত থাকবে গোপীনাথের।

তাই চায়ের দোকানে গোপীনাথ এলেই জাঁকিয়ে বসবে বলাইচাঁদ: তোর কি মনে হয় যুদ্ধটা এবার তাহলে লাগবে ভালো করে!

গোপীনাথ ঘাড় নেড়ে কাগজের একটা অংশ আবার চোখের কাছে তুলে ধরে বলে: অবস্থা যে ঘোরালো হয়ে উঠছে তাতে সন্দেহ নেই কোন।

মোটা বিপিন চোখ দু'টোকে শিব-নেত্রের মত করে চায়ের সঙ্গে আফিমের মৌজ করে এই

দোকানের এককোণে বসে। যে যা বলে চুপ করে শুনে যায়, বড় একটা মুখ খোলে না বিপিন। হাতের কাছে থাকে যে কোন একটা বই আর বিড়ির কৌটটা। হস্ত-রেখা বিচার থেকে হোমিও-প্যাথীর চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র বিপিনের কাছে পাওয়া যায়।

পঞ্চুর দোকানে এপাড়ার সকালের মজলিসে ভাঁটা পড়ে সকাল ন'টা নাগাত। আফিস, বড় বাজার, ক্যানিং ষ্ট্রিটের দোকানের চাকুরেরা বাড়ী ছোটে। কোন মতে নাকে মুখে কিছু গুঁজে পানটা নিয়ে ট্রামের জন্য মোড়ে এসে দাঁড়ায় ব্যস্ত হয়ে—লেট হোল বুঝি! কড়া কথা, মাইনে কাটার এর চেয়ে বড় ছুতো কর্তাদের আর কিছুই নেই।

—ও-মা ভাত বাড়ো, দেরী হয়ে গেল যে! স্কুলে যাব না নাকি? আমাকে কি ভাত দেবে না?

—দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি! অত তাড়াতাড়ি পারি নে বাপু! বাপ-কাকারা খেয়ে বের হোক্, তোমার তো আফিস করতে হবে না!

কলতলায় মগ থেকে শপাশপ্ জল পড়ে। ব্যস্ততার সঙ্গে স্নান সারা চলে। মাঝে মাঝে সুরের গুনগুনানি ভেসে আসে জল ঢালার শব্দ ছাপিয়ে।

—ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং, কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং, ধান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্।

কেউবা মায়ের নাম করে স্নান সমাপন করে:

—সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি—

তারপর মোড়ে এসে ট্রাম ধরা মস্ত একটা কসরৎ। এ নিত্যকালের ব্যাপার; শীতকালেও গলদঘর্ম্ম হয়ে, পানের পিচ গালের কষ বেয়ে নামিয়ে দিয়ে বিরাজ বুড়ো এখনও আফিস করে। ওরি মধ্যে দু'একটা চুট্‌কি, একটু রসের কথাবার্ত্তা বাদ যায় না। গোপীনাথ কাছে থাকলে বিরাজ বুড়োর মুখ ছোটাবার উপলক্ষ্য নতুন করে খুঁজতে হয় না: কি ভায়া রসে রসবড়া হয়ে এলে নাকি? হা কৃষ্ণ, বয়সটা যে কোথায় গেল!

লাজুক গোপীনাথও মুচকি হাসে দাদুর কথার চিমটিতে। ফোড়নও কাটে গোপীনাথ—বয়সটা কমিয়ে দিক না দাদু, দিদিমা তাহলে নতুন করে উৎসাহ পায়!

—উৎসাহ পেলে কি হবে বলো ভায়া, চোখে ধরে না যে?

—সে কি দাদু?

—হ্যাঁ হে ভায়া। আমার চোখটা যে তোমাদের নব-বৃন্দাবনের চোখ পেয়েছে। নথ-নোলক পরা রাধিকার বেসম আর খোলের গন্ধে আর কি প্রাণ মধুময় হয়? বরং কেমন যেন নাকটা কুঁচকে যায়।

—সে কি দাদা? সহযাত্রীরা যোগ দেয় হাসতে হাসতে।

—আজকালকার একটা রাধা খুঁজবো নাকি?

—খুঁজতে হবে কেন, তোমার ঘরেই তো রয়েছে আয়ান মশাই।—চোখটা ঠেরে বলে বিরাজ

বুড়ো। এমনি নানা ধরণের চুটকি চলে আফিস যাওয়া-আসার পথে-পথ-বিরক্তি নিরসনের জন্য।

মোড়ের মাথায় একটা মুসলমানদের হোটেল আছে। দশটার পর থেকে বিড়িওয়ালা, ঝাঁকা মুটে, ফিরিওয়ালা, ঘুড়িওয়ালা, গাড়োয়ানরা আসবে এক এক করে ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে; দু' পয়সা থেকে তিন আনা খরচ করলে বড় রুটি চারখানা আর সবজি বা মাংস বড় প্লেটে করে মাদুরে দিয়ে যাবে সঙ্গে এক বদনা জল—পরমতৃপ্তিতে খাওয়া সাঙ্গ করবে এই সব বিদেশী খাটিয়ে মানুষগুলো। তারপর আবার বেরিয়ে পড়বে রোজগারের ধান্দায়।

মোড়ের মাথায় একটা হাই স্কুলও আছে—এ পাড়ার ছেলে ছাড়া পাশের ষ্ট্রীট, লেন, বাই লেনের থেকে অনেক ছেলে আসে পড়তে। মোটামুটি বেশ বড়ই স্কুলটি। সকালের দিকে মেয়েদের ক্লাসও হয়—সাড়ে ছটা থেকে দশটা। মেয়ে কিন্তু খুবই কম ছেলেদের তুলনায়। তবু ইদানীং একটু বেশী; মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে অনেকেই চাচ্ছে। বড়দের নানান টিপ্পনি সত্বেও বর্ত্তমান অভিভাবকেরা মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে সচেতন।

তাই দশটা বাজলে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ী ফেরে বেশ সহজ সাবলীলাভাবে ছেলেদেরই মত। জড়তা কাটছে মেয়েদের। অতিরিক্ত লজ্জার রাংতায় নিজেকে মুড়ে রাখবে না এখনকার পড়ুয়া মেয়েরা এ সত্যটা বুড়োরা বিকৃত করেও স্বীকার করবে।

ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে, আফিসের বাবুরা আগেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। ছাত্রীরা বাড়ী ফিরছে—পাড়ার রাস্তাটা তাই ব্যস্ত। বাড়ীগুলোর এবার ঝিমুনি সুরু হবে—কর্ম্মব্যস্ত ঝি-বৌরা হাঁপ ছাড়লো; ঢিলে তালে বাকী রান্না সেরে ধীরে সুস্থে গল্প করতে করতে আহার করবেন বাড়ীর মা-মেয়ে-শাশুড়ী-বৌয়েরা। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম, কলে জল না আসা পর্য্যন্ত। মাসিকপত্র মহাভারত, রামায়ণ, সিঁথির সিঁদুর, নীলবসনা সুন্দরী, স্বামীর ঘর-ত্যাগ বইগুলো—এ পাড়ার একটু বেশী বয়সের গিন্নীরা দিবানিদ্রার ওষুধ হিসাবে এখনও ব্যবহার করে। মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে বাড়ীর ছেলেদের অব্যবহৃত বালিসগুলো মাথায় দিয়ে পান দোক্তা চর্ব্বন করতে করতে চোখের সামনে বই-এর একটা পাতা খুলে ধরেন। তারপর যে বেহুঁস হয়ে পড়ে যাবেন গড়্‌গড়্ করে তেমনটি কদাচিৎ ঘটে থাকে। কচি ছেলেপুলেগুলোর দুষ্টুমি, পাঁচটা ঘরোয়া কথাবার্ত্তা, ত্রুটি বিচ্যুতির মীমাংসা শালিসীও কোন কোন মনকে বিরক্ত করে তোলে; মুখ-বিকৃতির সঙ্গে বলেও ওঠেন, হাড়-মাস কালি করে সংসার করার মত ঝক্‌মারি যেন সত্যুরেরও না হয়। কবে শেষ হবে।

অল্প-বয়সী বৌ-ঝিয়ের বৈঠক বসে আলাদা। তাম্বুলরঙা অধরে হাসির রেশগুলোই এক একটি নতুন গল্পের ইংগিত দেয়। দাদাদের খুঁটিনাটি দাম্পত্য-কলহ শেষে বৌ-য়ের পদ-সেবা করার খবর-টুকু নিয়ে হাসাহাসি করাও বাদ যায় না। পাশাপাশি বাড়ীগুলোর রস-বিরসের খবরাখবর আদান প্রদানের সময়ও এই নির্জ্জন দ্বিপ্রহর। গিন্নী আর কুমারী মেয়েরা পাড়া বেড়াতে বের হন। দুটি বাড়ীতে এ পাড়ার মেয়েদের আড্ডাও জমে। তাঁদের বিন্দি খেলা এখনও মিত্তির গিন্নী চালু রেখেছেন। নিজে আর বসে খেলতে পারেন না; বয়স বেড়েছে, আর মোটাও হয়েছেন খুব। পাশে শুয়ে আড্ডাটা জমিয়ে রাখেন।

আর একটি মেয়েলী বৈঠক জমে মিত্তির বাড়ীর পাশে মুখুজ্যে বাড়ীতে বৃদ্ধ ভুবনমোহিনীর ঘরে। কম্বলের বিছানা থাকে। বৃদ্ধার সংখ্যাই বেশী এ বৈঠকে। মহাভারত পড়া হয় এ বৈঠকে। বাল-বিধবা শান্তি হোল এ বৈঠকের পাঠিকা। শান্তি মিত্তির গিন্নীর ছোট মেয়ে, ভুবনমোহিনীর প্রিয় পাত্রী। আর ভুবনমোহিনীর নাতি সত্যজিৎ-এর ভালোদি। শান্তি সুর করে মহাভারতের একটি পাতা পড়ে যায়। ভালো লাগে ওর মহাভারত পড়তে ছোট বেলা থেকেই। ভুবনমোহিনী তখন নিজে পড়তেন; শান্তি আসতো, বসে শুনতো। তারপর দশ বছরে পড়তেই ঘটা করে বিয়ে হোল। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে শাঁখা সিঁদুর খুইয়ে ফিরে এল। দাদুর আদরের নাতনী। তাই প্রথমে সাদা থান পরতে দিতে চান নি। কিন্তু শান্তি তখনি ম্লান হেসে বলেছে—পাপ হয় যে দাদু! থানই পরবো।

বুড়ো দাদু শান্তির সেদিনের কচি মুখের পানে চেয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। সেই থেকে শান্তি আরো শান্ত। ঠাকুর ঘর, ভুবনমোহিনীর সঙ্গ আর দাদুর পরিচর্যার মধ্যে দশটা বছর কাটিয়ে এসেছে। আজকাল দাদুর পরিচর্যা নেই, তার জায়গায় আর এক জনের খেয়াল খুশি শান্তিকে মেটাতে হয়। সে হোল সত্যজিৎ—ভুবনমোহিনীর নাতি। শান্তির মা মিত্তির গিন্নী সময় সময় বিরক্ত হন সত্যজিৎ-এর দৌরাত্ম্যে। কিন্তু কিছু বলতে কেমন যেন বাধে। হয়ত শান্তির জন্যে হয়ত বা ছেলেটার নিজস্ব কোন আকর্ষণের জন্যে।

একমাত্র কাকা বিপিনকে ছেলেটা ভয় করে। বিপিনও ছেড়ে কথা কয় না—সুযোগ পেলেই শাসন করে। কিন্তু ভুবনমোহিনী সে সুযোগ খুব কমই দেন। আর শান্তির অভয় তো আছেই। এখানে বিপিন একেবারে ঠাণ্ডা। অন্তরঙ্গ বন্ধুর এই ছোট মেয়েটাকে ছোট বেলা থেকেই খুব ভালো বাসেন। তাই শান্তির জোর বিপিন কাকার ওপর সকলের থেকেই বেশী।

ক্রমশঃ

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন

যুগস্রষ্টা কবি-সাহিত্যিক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন। যে-দেশের ভাগ্যে এই রুচিৎ-সৌভাগ্য ঘটে, সে-দেশের সাহিত্য প্রায় রাতারাতি পরিপূর্ণতা লাভ করে। পচিশে বৈশাখের পুণ্য দিনটি আমাদের এমন সৌভাগ্যের পরিচয়ই বহন করছে। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বাংলা দেশে যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায় প্রতি বছর, তার তুলনা মেলা ভার। পৃথিবীর আর কোন কবি বা সাহিত্যিকের জন্মোৎসব এমন ব্যাপকভাবে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ পালন করেন না। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ তো শুধু কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না; সমস্ত দিক দিয়ে আমাদের দেশকে তিনি অনেক অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর জন্মোৎসবে একথা আমরা বার বার হৃদয়ঙ্গম করি। আমাদের চিন্তায়, লেখায় তাঁর প্রভাব সর্বদা অনুভূত হয়। আর এই কারণেই তাঁর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা স্বতোৎসারিত। প্রতি বছর তার প্রকাশ ঘটে কবি-পক্ষে।

কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-প্রকাশকে ইদানীং অনেকে নিন্দা করতে সুরু করেছেন। অনুষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য ঘটায় তাঁরা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আরো অভিযোগ যে, রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে শুধু নাচ-গানই পরিবেশিত হয়; এই সব অনুষ্ঠান যাঁরা করেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অজ্ঞ, রবীন্দ্র-আদর্শ মেনে চলেন না, রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ করেন না ইত্যাদি।

কে না জানে যে, সাহিত্য-পাঠ বা সাহিত্যের রস আস্বাদন সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার; উপরন্তু সাহিত্য-শিক্ষা ব্যতিরেকে তা সম্ভবও নয়। সমস্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য হয়ত অনেকেই পড়েননি এবং তা একজীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করা সম্ভব কিনা তাও জানিনা, কিন্তু এ বড় অদ্ভুত কথা যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে তথাকথিত পণ্ডিত না হলে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করার অধিকার জন্মায় না। আর নাচ-গানে আপত্তি কেন? রবীন্দ্রনাথ কি বাংলা দেশের সবচেয়ে বড় সঙ্গীতস্রষ্টা নন? রবীন্দ্রনাথ কি বলেননি তাঁর গানের মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন? রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে একই উক্তির পুনরাবৃত্তি শোনার চেয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনা অনেক ভাল। কারণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত জগত ও জীবনের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আনে, মানুষকে মানুষের নিকটতর করে। বাংলা দেশে নৃত্যনাট্য রবীন্দ্র-নাথের একটি নতুন সৃষ্টি। নৃত্য এবং সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে নাট্যরস ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার চরম দেখিয়ে গেছেন তাঁর নৃত্যনাট্যগুলির মাধ্যমে। এপথে আরো অগ্রসর হবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শুধু যে কলা-সৃষ্টির দিক দিয়ে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের গুরুত্ব তাই নয়, পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি মহৎ কাজ করেছেন। এই নৃত্যনাট্যগুলি বাংলা দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে এবং সামাজিক সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। তাই যদি কেউ নাচ-গানের কথা তুলে উন্নাসিকতা দেখান এবং ভারিক্কী চালে বলেন—ও হচ্ছে তারল্যের

পরিচয়, তাহলে তাঁর রস-বোধে সন্দেহ জাগে বৈকি। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে এবং রবীন্দ্র-আদর্শের প্রতি দেশবাসী শ্রদ্ধান্বিত বলেই এত রবীন্দ্র-জয়ন্তী-অনুষ্ঠান। তা নিয়ে কটূক্তি করা শোভা পায়না।

প্রতি বছরের মত এবারেও নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র-জন্ম-সপ্তাহ পালন করলেন। এই উপলক্ষ্যে পঁচিশে বৈশাখ থেকে পয়লা জ্যৈষ্ঠ এই অষ্টাহব্যাপী অনুষ্ঠানে আলোচনা, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্যগীতালেখ্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এ-বছর আলোচনার ভাগ কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে কর্তৃপক্ষ সুবুদ্ধির পরিচয়ই দিয়েছেন। কিন্তু পরিবর্ত্তে যদি রবীন্দ্র-রচনা থেকে পাঠ প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে অন্ততঃপক্ষে আধ ঘণ্টার জন্যে স্থান পেত, তবে তাঁদের ধন্যবাদ জানাতাম। আশা করি আগামী বছর তাঁরা এদিকে দৃষ্টি দেবেন। বাংলা দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের দিয়ে রবীন্দ্র-রচনা থেকে পাঠের ব্যবস্থা করলে সবচেয়ে ভাল হয়।

পাঁচ দিন পাঁচ জন বক্তা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার বিষয় ছিল "রবীন্দ্রনাথের তুমি"। মোটামুটি বললেন—তবে পুনরাবৃত্তির ফলে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা ছিল। অনুষ্ঠান-সূচী থেকে জানতে পারি অমল হোমের বক্তার বিষয় ছিল "রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা"। শ্রীহোম এক ঘণ্টার ওপর বক্তৃতা করেন, কিন্তু "মায়ার খেলা" সম্পর্কে বলেন মাত্র কয়েক মিনিট। বাকী সময় তিনি আবোল-তাবোল বকেছেন; কখনও বলেছেন, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব আজকাল রবীন্দ্র-বারোয়ারীতে পরিণত হয়েছে, কখনও-বা এ-ব্যাপারের অধিকারীভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। উদাহরণ সহযোগে রাজ্যেশ্বর মিত্রের "প্রাচীন বাংলা গানের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত" সম্পর্কে আলোচনাটি মূল্যবান। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রকুমার দাসের "রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় দর্শনের" ওপর আলোচনা এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহে নতুন আলোকপাত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য "রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বাত্মবাদ" সম্পর্কে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনা। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলেন।

কিছু রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের ব্যবস্থাও ছিল। শুভময় ঘোষ ও বীরেন বসুমল্লিকের আবৃত্তি ভাল লাগল।

একক সঙ্গীতে সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়েছে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান। বিশেষ করে "আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেব" অপূর্ব। বহুকাল তাঁর কণ্ঠে এমন গান শুনিনি। এরপরেই উল্লেখ করতে হয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তান-সহযোগে "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" গানটি এক অভূতপূর্ব রস-সৃষ্টি করেছিল। অনেক নতুন শিল্পীকে অনুষ্ঠানে স্থান দিয়ে সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। নতুন ও পুরোনো শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের নামোল্লেখ করছি: অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, অশোক সরকার, তপন গুহরায়, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা চক্রবর্ত্তী, প্রশান্ত ঘোষ, গীতা সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বনানী ঘোষ, সুমিত্রা সেন, নৃপেন মুখোপাধ্যায়, পারমিতা নাগ, গীতা ঘটক।

নৃত্যনাট্য "মায়ার খেলা" এবং "চিত্রাঙ্গদা" পরিবেশন করেন যথাক্রমে গীতবিতান ও রবিতীর্থ।

অনুষ্ঠান দুটি যত উন্নতশ্রেণীর হবে আশা করা গিয়েছিল, তা হয়নি। কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব "মায়ার খেলা" অনুষ্ঠানটির যথাযথ আবেদনে বাধা সৃষ্টি করেছে। মনে হয়, বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ভূমিকার নৃত্যগুলি পরিকল্পনা করেছেন বলেই এই ত্রুটি দেখা দিয়েছে। কয়েকটি একক-সঙ্গীত একেবারে প্রাণহীন লাগলো। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, গীতবিতানের মত প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনও তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকেই প্রায় সমস্ত একক-সঙ্গীতশিল্পী সংগ্রহ করেছেন। নৃত্যাংশে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন প্রমদার ভূমিকায় ঝর্ণা মজুমদার ও "চিত্রাঙ্গদা"য়ও ঝর্ণা মজুমদার কুরূপা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাঁর ব্যথামান অভিনয়ের পাশে অনাদিপ্রসাদের অর্জ্জুনের ভূমিকা দর্শকদের মনে কোন আবেদনই সৃষ্টি করতে পারেনি। সুরূপা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় গীতা ঘোষ ব্যর্থ। সখীদের নৃত্যগুলি যথাযথ হয়েছে। অনাদিপ্রসাদ অর্জ্জুনের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। শুধু শারীরিক কৌশল দেখিয়েছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়েছে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে চিত্রাঙ্গদার গানগুলি এবং শৈলেন দে'র খোলে সহযোগিতা। দ্বিজেন চৌধুরীর কণ্ঠে গানগুলি ভাল হয়নি।

"নবীন" রবীন্দ্রনাথের একখানি নৃত্যগীতালেখ্য—পরিবেশন করেন "প্রান্তিক" প্রতিষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি সকলকে আনন্দ দিয়েছে। কয়েকটি একক-সঙ্গীত এবং সমবেত সঙ্গীতগুলি সুগীত হয়েছে। তবে কয়েকটি নৃত্যের পরিকল্পনা পীড়া-দায়ক।

এছাড়া আর এক ধরণের অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়েছে, যেগুলি তৈরী করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার মাঝে মাঝে গান দিয়ে, অথবা কতকগুলি গান বেছে নিয়ে ধারাবাহিক-ভাবে সাজিয়ে রবীন্দ্ররচনাসহ নৃত্যের মাধ্যমে রূপ দেওয়া হয়েছে। কথাকলির "পূজা" গীতবিতানের পূজা-অংশের কতকগুলি গান সাজিয়ে প্রয়োজনমত কথা যোগ করে নৃত্যে রূপায়িত করা হয়েছে। সঙ্গীতাংশ উচ্চাঙ্গের হয়েছে। মঞ্জুশ্রী চাকীর নৃত্যাংশ পরিকল্পনা যথাযথ। ব্যঞ্জনা মোটেই ভাল হয়নি। নৃত্য-কলালয়ের "সামান্য ক্ষতি"তে কিঞ্চিৎ নাট্যরস ফোটানোর চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা ঠিক জমাট বাঁধেনি। তবে সমগ্রভাবে বিচার করলে বলা যায় "সামান্য ক্ষতি"-উত্তরে গেছে। "ভানু-সিংহের পদাবলী" অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। নৃত্যাংশে রাধার ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বনশ্রী ঘোষ।

নাটকের অভিনয় এবার তেমন জমেনি। সঙ্গীতে বৈতানিকের যথেষ্ট সুনাম আছে এবং কিছুকাল পূর্বে "শেষরক্ষা" নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু "পরিত্রাণ" নাট্যাভিনয় করতে গিয়ে দুর্নামের ভাগী হলেন। "পরিত্রাণ" নাটকের কোন অংশই উল্লেখ করার মত নয়।

"দুই বোনে"র মত সংলাপ-সর্বস্ব উপন্যাসকে নাট্যান্তরিত করে অভিনয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন শনিবারের বৈঠক। "দুই বোনে"র নাট্যরূপ এবং অভিনয়াংশ অত্যন্ত দুর্বল।

প্রদীপকুমার বসু

গ্রন্থপরিচয়

স্বপ্ন-কোরক : দক্ষিণারঞ্জন বসু। ক্যালকাটা বুক ক্লাব। ছ টাকা।

এখনকার গল্প-উপন্যাসে নরনারীর মনোবিকলন প্রধান উপজীব্যের মর্য্যাদা পেয়েছে। আধুনিক বিদেশী কয়েকজন লেখক শুধুমাত্র এই পথেই সাহিত্যে সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করছেন। তাই দেখা যাচ্ছে তাঁদের রচনা বিকারগ্রস্ত, যৌন-রোগাক্রান্ত, অসুস্থ চরিত্রের চিত্রশালা। মানুষের জীবনে সময়ে-সময়ে যে-সব বিকৃতি দেখা যায়, যা নিতান্ত বিরল বলেই অগ্রাহ্য করা উচিত, সেগুলোকেই প্রাগুক্ত লেখকরা অনাবশ্যক প্রাধান্য দিচ্ছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর য়োরোপের ব্যক্তি ও সমাজ নানা ঝড়ের দোলা সহ্য করেছে। সেখানে ব্যক্তি-জীবনে সঙ্কট এবং মনের জটিলতা অবশ্যম্ভাবী। তা সাহিত্যে উপস্থাপনের ভঙ্গী নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকেও, তার ছায়াপাত একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে যদি আর অনুকরণ, এমন কি অনুলিখন চলে তবে আশঙ্কার কারণ ঘটে। আজকাল অনেক বাংলা গল্প উপন্যাসে পাশ্চাত্য নরনারীর মনোবিকলনকে বাঙালী-চরিত্রে আরোপ করা হচ্ছে। যে-ধরণের জটিলতা, যে-শ্রেণীর যৌন-বিকৃতির বাঙালী-জীবনে একান্ত অসম্ভব, কোন কোন সাহিত্যিক তাকে গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু করে বিকৃত আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন।

আশার কথা এই যে, সকলেই রাহুগ্রস্ত নন। অনেকে গভীর জীবন-বোধ, ব্যাপক সাহিত্য-দৃষ্টি, মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকে সাহিত্য রচনা করছেন। এই শেষোক্ত গুণের সার্থক উপস্থিতি দেখা যায়, আলোচ্য গল্পগ্রন্থের লেখক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর লেখায়। 'স্বপ্ন-কোরকের' গল্পগুলি পড়তে পড়তে লেখকের আন্তরিকতায় বিস্মিত হতে হয়। নিরলঙ্কৃত ভাষা, কোন অংশই চেষ্টাকৃত নয়—প্রায় মুখের ভাষাই কলমের ভাষা হয়েছে। আর যাদের জীবন নিয়ে লেখা হয়েছে তারাও সহজ সাধারণ মানুষ ; দুঃখী-দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু মানসকূটে ভোগে না। মধ্যবিত্ত মানুষও গল্পে স্থান পেয়েছে, তবে কোথাও লেখক মানব-মনের অতলান্ত-রহস্য উদ্ঘাটন করার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন নি ; তিনি মানুষের বাহিরটা নিয়েই তৃপ্ত। মানুষের দুঃখ-জীবনের পাঁচালীকার তিনি।

হীরেন বসু

জর্ণাল : সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। কাহিনী। ছ টাকা।

'জর্ণাল' শ্রীসন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। কিছুকাল যাবৎ এই নবীন লেখকের ছোটগল্প নক্সা রেখাচিত্রাদি প্রগতিবাদী পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হচ্ছে ; তারই মধ্য থেকে বাছাই করা কয়েকটি গল্প বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। লেখক কি চিন্তায়, কি গল্পের প্লট সংযোজনায়, কি ভাষারীতির প্রয়োগে সবিশেষ অভিনবত্ব-প্রয়াসী বলে মনে হল। এক ধরনের

অস্পষ্ট কাব্যকুয়াসায় তাঁর সব কটি লেখা আবৃত হয়ে আছে। এ রীতি জীবনানন্দ—বিষ্ণু দে—অমিয় চক্রবর্তীর আশ্রয়ী আধুনিক কাব্যকলায় হয়তো বেমানান ঠেকে না, কিন্তু গদ্যভঙ্গিতে, বিশেষ, ছোটগল্পে এ রীতির প্রয়োগ পাঠকের মনে এক ধরনের বিমূঢ়তার সৃষ্টি করে তার পাঠক্রিয়াকে অস্বস্তিময় করে তোলে। লেখক নূতন শব্দচয়নে অত্যুৎসাহী, কিন্তু শব্দের ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি সচেতন নন। রোমান্টিক ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত যে কোন নবীন লেখকের মতো তাঁর বলার কথা আছে অনেক, এমনি কি জায়গায় জায়গায় তাঁর লেখনীর শক্তিও অলক্ষ্য নয়, কিন্তু যতদিন না তিনি তাঁর গল্পকাহিনী গল্পোচিত প্রাঞ্জলতায় সুবিন্যস্ত সংযমের সহিত গুছিয়ে প্রকাশ করতে সমর্থ হচ্ছেন ততদিন তাঁর রচনা খণ্ডিত হয়েই থাকবে।

'স্যানাটোরিয়ম,' 'অন্ধ', 'উত্তর উত্তমা' প্রমুখ গুটি কয়েক গল্প শব্দের ও বক্তব্যের দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও মোটামুটি গল্পের আকার লাভ করেছে। নবোদ্ভিন্ন-যৌবন তরুণ-তরুণীর প্রেম অধিকাংশ গল্পেরই বিষয়বস্তু, তাতে এ রকম ধারণা করা অন্যায় হবে না যে, লেখক এখনও মানসিকতার দিক থেকে বয়ঃসন্ধির স্তরে আবদ্ধ হয়ে আছেন। সস্তা মন-দেয়া-নেয়ার কাহিনীই যদি একালীন নবীন সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য হয়, তবে সে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভেবে আশান্বিত হওয়া যায় না। আজকালকার লেখকগণ সবাই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত বিধিবিধানের সম্পর্কে বিরুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন, তবে এত বেশী প্রেম নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করেন কেন? তা-ও আদর্শবাদের কঠিন পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ আত্মবিলোপ-কামী মহৎ প্রেম নয়, নিতান্ত দেহ-সর্বস্ব ভ্যাপসা রিরি প্রেম? 'ভূত ভাই-বোনের' ভালোবাসা ও মাসী ও বোন-পোর কল্পিত অনুরাগের চিত্র উপস্থাপিত করে লেখক কোন্ মহতী সিদ্ধির অভিমুখে সমাজকে চালিত করতে চান বুঝে ওঠা দুষ্কর।

তবু নবীন লেখকের রচনার উৎসাহকে দমিত করব না। নবীন-লেখকের প্রতি প্রবীণবয়সী পাঠকের সস্নেহ অনুরোধ, তিনি কিছুকাল অভিনিবেশের সহিত চিন্তার শৃঙ্খলা ও ভাষার সংযম অভ্যাস করুন। আগে পরিশ্রমের দ্বারা বাংলা গদ্যের স্বীকৃত রূপটিকে আয়ত্ত করুন, তারপর যে ভাষা নিয়ে অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহুতর সুযোগ তিনি পাবেন। বহুদিন সমিল কবিতায় হাত পাকিয়ে রপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যেমন সার্থক গদ্যকবিতা লেখা যায় না, তেমনি প্রচলিত গদ্যরীতি আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত তার শৃঙ্খলাকে নূতন পরীক্ষা-প্রয়াসের দ্বারা অস্থির করে তোলারও অধিকার জন্মায় না। সব সাহিত্যেই ভাষার একটা standardised রূপ থাকে, বহুদিনের অভ্যাস ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এ রূপ সংবদ্ধ হয়, তাকে লঙ্ঘন বা অতিক্রম করার এক্তিয়ার অতি বড়ো আধুনিকতাভিমানী লেখকেরও নেই। নবীন লেখকের কল্পনায় বেগ আছে, কিছুটা মৌলিকতাও তাতে পরিলক্ষণীয়, তিনি উপরের কথাগুলি স্মরণে রাখলে উপকৃত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

নারায়ণ চৌধুরী

গল্প কিছু নয় : রামকৃষ্ণ গুপ্ত। শ্রীবিদ্যানিকেতন। দুটাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের আসরে নবাগত। আর 'গল্প কিছু নয়' তাঁরি সাহিত্যকর্ম্মের প্রথমতম নিদর্শন—সাতাশটি ছোটগল্পের সংকলন। মাত্র একশো সতেরো পৃষ্ঠার মধ্যেই ধরে গেছে বিভিন্ন সুরের সাতাশটি গল্প; এথেকেই গল্পগুলোর আয়তন অনুমান করা যায়। ছোটগল্প ছোটও হবে, আবার গল্পও হবে। কিন্তু তা কতটুকু ছোট হবে—গল্পকে কতটুকু মিহি করে কাটলে তা ছোটগল্প হবে, তার সার্থকতম নিদর্শন 'বনফুলের' গল্পে। রামকৃষ্ণ গুপ্ত বনফুলেরই উত্তরসূরী। গুপ্তমশাই সজ্ঞানে বনফুলকে অনুসরণ করেছেন, কোথাও কোথাও অনুকরণও করেছেন, কিন্তু সুখের কথা কোথাও তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়নি। লেখকের দরদী মনের স্নিগ্ধ লাবণ্যে বরং তা রসোত্তীর্ণই হয়ে উঠতে পেরেছে—এইটুকু তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। রামকৃষ্ণবাবুর মধ্যে বনফুলের যোগ্য উত্তর-সাধককে দেখতে পেয়ে আমরা খুশীই হয়েছি। সিদ্ধ শিল্পীকে অনুসরণ করা সব সময় নিন্দার নয়। নবীন প্রতিভা লব্ধপ্রতিষ্ঠের দীপ্তচ্ছটায় নিজেকে তো রাঙাবেই। অনুসরণ করতে করতেই সে একদিন নিজের সরণি খুঁজে পাবে—তৈরী করে নেবে নিজের আদর্শ নিজের দর্শন। 'গল্প কিছু নয়' পড়ে রামকৃষ্ণবাবুর সম্বন্ধেও এই আশা আমাদের মনে জাগছে। ছোটগল্পকৃতি কবিকর্ম্মেরই সমগোত্রীয়। সেই কবি-মনের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর একধিক ছোটগল্পে। আঙ্গিকের দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের পরিচয় না দিতে পারলেও দরদী মনের স্নিগ্ধ কারুণ্য দিয়ে তিনি সে ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছেন। গল্পগুলোর মধ্যে তাঁর অসাধারণ বাক-সংযম, সূক্ষ্ম জীবন-দর্শিতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী করতে পারে। কত সহজ করে, কত মিষ্টি করে তিনি যে গল্প বলেছেন তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। অবশ্য সব কটি গল্প সম্বন্ধে সে কথা বলতে পারলেই খুশী হতাম কিন্তু এতে এমন দু'একটি গল্প রয়েছে যা লেখকের অবহেলার সৃষ্টি। তবে সুখের কথা তারা সংখ্যায় বেশী নয়। সুশোভন প্রচ্ছদপট, উত্তম ছাপা বাঁধাই এবং অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্যের ভূমিকা সম্বলিত এই সংকলনটি বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারে একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন বলেই গণ্য হবে।

নির্মাল্য বসু

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও ৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ সাভিস্ প্রিণ্টার্স হইতে মুদ্রিত।

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে
বিজয়-বৈজয়ন্তীবাহী
মোহিনী মিলস্
লিমিটেড
(স্থাপিত—১৯০৮)
১ নং মিল
কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)
২ নং মিল
বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :
চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

UNITED INDIA AGENCY
IMPORTER & EXPORTER
Stockists & Dealers in :
ELECTRICAL, HARDWARE, MILL STORES & MARINE GOODS
3/1, MANGOE LANE (1st floor)
CALCUTTA-1

ON GOVT. RATE CONTRACT
KIRON
THE BETTER LAMP
AGENTS:
The ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD
CALCUTTA • BOMBAY • KANPUR

Tropical
THE BETTER FAN
on Govt. Rate CONTRACT
AGENTS:
The ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD
CALCUTTA • BOMBAY • KANPUR

THE ORIENTAL MERCANTILE CO., LTD.
CALCUTTA, BOMBAY, KANPUR, DELHI.